আমি পদ্মজা - ৭১

_____

সকালের ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে প্রকৃতি। কাঠের দুই তলা বাড়ির উঠানে শুটিং দলের সবাই বসে আছে। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে আসা কনকনে শীত সবাইকে কাবু করে ফেলেছে। সবার মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শাকিল নামে একটা ছেলে উঠানের মাঝে আগুন ধরালো। লিখন আগুন থেকে তাপ নেয়। তীব্র ঠান্ডার জন্য শুটিং এগোচ্ছে না। বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। সূর্য যখন আকাশে উদিত হয়,মৃদুলের দেখা মিলে। সে লিখনের সাথে করমর্দন করে বললো,'কেমন আছো ভাই?'
লিখন হেসে বললো,'ভালো। এই শাকিল,একটা চেয়ার দিয়ে যাও।'

শাকিল চেয়ার দিয়ে যায়। মৃদুল বসলো। দুজন বড়ই গাছের নিচে বসে আছে। সেখান থেকে অলন্দপুরের বড় সড়ক দেখা যায়। লিখন বললো,' তারপর কেমন আছো?'
'জি ভাই,ভালো আছি। একটা দরকারে আইছি ভাই।'
লিখন মৃদুলের দিকে মুখ করে বসলো। মৃদুল লজ্জা পাচ্ছে। লিখন বললো,'পূর্ণার ব্যাপারে কিছু?'
মৃদুলের অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সত্যি সে লজ্জা পাচ্ছে। ঘাড় ম্যাসেজ করতে করতে বললো,'পূর্ণারে কেমনে কী বলতাম বুঝতাছি না। একটু বইলা দেও।'
লিখন সশব্দে হাসলো। মৃদুলের সাথে যতবার তার দেখা হয় ততবার সে হাসতে বাধ্য! মৃদুল বললো,'আমির ভাই আর তুমি এসব অনেক ভালো বুঝো। আমির ভাইরে ডর লাগে তাই তোমার কাছে আইছি।'
লিখন বললো,'এটা কোনো ব্যাপার?'
তারপর দূরের পথে চেয়ে বললো,'আমার একটা ইচ্ছে ছিল। শীতের জ্যোৎস্নায় নৌকা নিয়ে মাঝ নদীতে যাব। নৌকায় আমি থাকব আর আমি যাকে ভালোবাসি সে থাকবে। চারিদিকে জ্যোৎস্না টুপটুপ করে পড়বে, সে সময়টাকে সাক্ষী রেখে বিয়ের প্রস্তাব দেব। মনের সব অনুভূতি জানাব। কিন্তু আমার ভাগ্যে সেই সময়টা আসেনি। তুমি চেষ্টা করতে পারো।'
লিখনের কথা মৃদুলের খুব পছন্দ হয়। সে প্রফুল্লিত হয়ে বললো,'সুন্দর বলছো ভাই।'
তারপরই মুখ গুমট করে বললো,'কিন্তু এখন তো জ্যোৎস্না নাই।'
'শুনেছি,শুক্রবার জ্যোৎস্না রাত। আমাদের জ্যোৎস্না নিয়ে কাজ আছে।'
'নায়িকারে ভালোবাসার কথা বলবেন নাকি?'
'না,নায়িকা মারা যাবে।'
মৃদুল উঠানের দিকে তাকিয়ে বললো,'ভাই,নায়িকা কোনডা?'
লিখন আঙুলের ইশারায় একটা মেয়েকে দেখিয়ে বললো,'নীল শাল পরা মেয়েটা।'
মৃদুল মেয়েটাকে দেখে বললো,'এ তো আসমানের পরী।'
লিখন হাসলো। বললো,'পূর্ণার সামনে এই কথা বলিও না।'
দুজন একসাথে হাসলো। আরো অনেক কথা বললো। মৃদুল কথার ফাঁকে খেয়াল করেছে যে মেয়েটিকে লিখন নায়িকা বলেছে,সে মেয়েটি বার বার লিখনের দিকে তাকাচ্ছিল। দৃষ্টি অন্যরকম।
মৃদুল লিখনকে বললো,' ভাই,নায়িকা বোধহয় তোমারে পছন্দ করে।'
লিখন ফিরে তাকাতেই, মেয়েটি দ্রুত চোখ সরিয়ে নেয়। লিখন মৃদুলকে বললো,'আর ওদিকে তাকিও না। তোমার ধারণা সত্যি।'
মৃদুল উৎসুক হয়ে এগিয়ে আসে। আগ্রহ নিয়ে বলে,'উনার নাম কী?'
'ফারহিন তৃধা।'

'মাশল্লাহ, নামের মতোই সুন্দর। তোমার সাথে কিন্তু মানাবে।'
লিখন স্মিত হেসে বললো,'মানায় তো কতজনের সাথে আমরা কি সবাইকে পাই?'
মৃদুল 'না' সূচক মাথা নাড়াল। লিখন বললো,'তৃধা ছেলেমানুষ। নতুন এসেছে মিডিয়া জগতে। শুনেছি,আমার জন্য নাকি মিডিয়া জগতে এসেছে। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে ভুলিয়ে দিয়ে নিজে জায়গা করে নিবে। এটা কি ছেলেমানুষি ভাবনা নয়?'
লিখন হাসলো। হাসলো মৃদুলও। লিখন বললো,'আমরা জীবনে অনেক কিছু চাই। সব কিন্তু পাই না। এটা সম্ভব নয়। আমার কী নেই? সব আছে। কিছুর অভাব নেই। শুধু একটা অংশই ফাঁকা। সে অংশটা কখনো পূর্ণ হবে নাকি জানি না। পূর্ণ হবে একদিন,এটা ভাবাও ঠিক নয়। কারণ যাকে চাই সে পরস্ত্রী! তবুও মন ভেবে ফেলে। যদিও এই আশা পূর্ণ হয়, আমার বর্তমানে যা কিছু আছে তা থেকে কিছু একটা হারিয়ে যাবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। নিয়তি। কিছুর অভাব না থাকলে,তুমি কার পিছনে দৌড়াবে? কীসের আশায় বাঁচবে? অপূর্ণতা একধারে সৌভাগ্য আবার দূর্ভাগ্য।'
'তুমি অনেক বুঝো ভাই।'
'এইযে তৃধা পাগলামি করে,আমি কিন্তু মানা করি না। তালও দেই না। পাগলামি করে যদি নিজের মনকে তৃপ্ত রাখতে পারে তবে করুক না। সে তো জানে,আমার মন অন্যখানে ছুটে।'
'কতদিন অবিবাহিত থাকবা? এইবার বিয়ে করে নেও।'
'আম্মা,চিঠি পাঠিয়েছেন। কোন রাজনীতিবিদের মেয়ের সাথে বিয়ের কথা চলছে। এইবার ফিরে বিয়ে করতেই হবে। নয়তো নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। এটা কোনো কথা?'
'এইবার বিয়ে কইরা নেওয়া দরকার। খালাম্মারও তো ইচ্ছে করে ছেলের বউ দেখার।'
'মৃদুল তুমি সব জানো। তুমি খুব ভালো ছেলে। ভালোবাসাও বুঝো। তাই তোমার সাথে কিছু বলি। পদ্মজা শুধু একটা নাম না। আমার মনে হয় পদ্মজা শব্দটা একটা প্রাণ! আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। আমি খুব খারাপভাবে পদ্মজাতে ফেঁসে গেছি। আমার মাঝে মাঝে দম বন্ধকর কষ্ট হয়। তখন চেষ্টা করি,পদ্মজা নামক মায়াজাল থেকে বেরোতে। কিন্তু পারি না। এই যে বেঁচে আছি,প্রতি মুহূর্তে মনে হয় পদ্মজা আসবে একদিন আমার কাছে আসবে। মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচে। আশা পূরণ না হউক। আশা রাখতে তো দোষ নেই। বাঁচতে তো হবে। তৃধা আমাকে ভালোবাসে। আমি বুঝি। যখন শুটিং চলে,মুখস্থ ডায়লগগুলো তৃধা মন থেকে অনুভব করে আমাকে বলে। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না। আমার তখন খারাপ লাগে। আমি নিজে একজনের প্রেমে ব্যাকুল। তাই অন্য কারো ব্যাকুলতা আমি বুঝি। এখন আমি পদ্মজার অনুভূতিও বুঝি। পদ্মজার জায়গায় আমি দাঁড়িয়েছি। তৃধা আমাকে পদ্মজার অনুভূতি বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি তৃধাকে যেমন মনে জায়গা দিতে পারি না,পদ্মজাও আমাকে দিতে পারে না। পদ্মজা আমির হাওলাদরকে খুব ভালোবাসে। আমি নিজের ভালোবাসার সাথে তাদের ভালোবাসাকেও সম্মান করি। তাদের ভালোবাসা অতুলনীয়। বুকে একটু জ্বালাপোড়া হয় ঠিক তবে এটাই বাস্তবতা! তৃধার জন্য আমার মায়া হয়,মেয়েটা অন্য কাউকে ভালোবেসে সুখি হতে পারতো। ঘুরেফিরে এমন কাউকে ভালোবেসেছে যে অন্য কাউকে ভালোবাসে। আমার মত হয়তো পদ্মজাও ভাবে। তৃধার ভালোবাসাকেও আমি সম্মান করি। সে সত্যি মন উজাড় করে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সাড়া দেয়া সম্ভব নয়। এমনকি আমি তৃধাকে জায়নামাজে বসে কাঁদতেও দেখেছি। তবুও আমার মনে ভালোবাসা জন্মায়নি। ভালোবাসা খুব কোমল আবার খুব শক্তও। কিছু মানুষ একজনকেই ভালোবাসার জন্য জন্মায়। অন্য কারো ভালোবাসা তাকে ছুঁতে পারে না। তার মধ্যে আমি একজন। হয়তো পদ্মজাও তার মধ্যে আরেকজন। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। তৃধা ভালোবাসে আমাকে,আমি ভালোবাসি পদ্মজাকে,পদ্মজা ভালোবাসে আমির হাওলাদরকে! সবার ভালোবাসাই সত্য! কি কাণ্ড! এই পৃথিবীর সুখী মানুষ কারা জানো? তোমার মতো মানুষেরা।'

মৃদুল মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। সে অবাক হয়ে বলে,'আমার মতো?'
'হুম,তোমার মতো। তুমি পূর্ণাকে ভালোবাসো,পূর্ণাও তোমাকে ভালোবাসে। তোমাদের তৃতীয় ব্যক্তির যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। এই ভালোবাসাকে কখনো হারাতে দিও না। কপাল গুণে যাকে চাও সেও তোমাকে চায়। কখনো অসম্মান করো না,ধরে রেখো। ভালোবাসা খুব দামী! যা সবাই পায় না। আমাদের জীবনে মা-বাবা,নানা-নানি,দাদা-দাদি, ভাই-বোন অনেক মানুষ আছে। যারা আমাদের ভালোবাসে। তবুও আমরা জীবনসঙ্গীর জন্য পাগল হই। তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকি। তার ভালোবাসা ছাড়া নিজেকে শূন্য মনে হয়! এই মায়া পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে হয়ে এসেছে। আমিও তেমন একজনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে আছি। ঝাপসা ভোরে হাঁটছি। এই জায়গাটা অন্য কাউকে দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমি বিয়ে করব না। কোনো মেয়েকে জীবন্ত হত্যা করার অধিকার নেই আমার। আমাকে যে বিয়ে করবে সে সুখি হবে না। আমি পারব না। আমি স্বামী হিসেবে ব্যর্থ হয়ে যাবো। কলঙ্ক লেগে যাবে। আমি সেটা হতে দেব না। মনে একজনকে রেখে আরেকজনকে বিয়ে করে তাকে সুখি করা একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পারবো না। কারণ,আমি শতভাগ নিশ্চিত এই চ্যালেঞ্জে আমি হেরে যাব। যে যাই ভাবুক। একাই জীবন কাটিয়ে দেব। ভালোবেসে যাওয়াতেও শান্তি আছে। নিজের স্বার্থে সেই শান্তি আমি নষ্ট করব না। বিয়ের কথা আর কখনো বলো না। আম্মাকে আমি সামলে নেব। তুমি পূর্ণাকে দ্রুত বিয়ে করে নাও। যাই হয়ে যাক। কেউ কারো হাত ছাড়বে না। একজন পিছিয়ে গেলেই কিন্তু সব শেষ।'
মৃদুল লিখনের এক হাত ধরে বললো,'ভাই,তোমারে কী বলবো আমি বুঝতাছি না। কিন্তু পূর্ণারে আমি মরে গেলেও ছাড়ব না। আমি আমার সৌভাগ্য ধরে রাখব।'
লিখন মৃদুলের কাঁধে হাত রেখে বললো,'ভালো প্রেমিক হয়ে উঠো,ভালো স্বামী হয়ে উঠো। তুমি বসো। শুটিং শুরু হবে। পরে আবার কথা হবে।'
'যাও ভাই।'
শুটিং শুরু হয়। মৃদুল উঠে আসে। তৃধা নামক সুন্দরী মেয়েটির পরনে শাড়ি। কোমর সমান লম্বা চুল। রূপে কোনো কমতি নেই। তাও তৃধা লিখনের আকর্ষণ পাচ্ছে না। ভালোবাসা এতো অদ্ভুত কেন হয়?
মৃদুল তৃধাকে খেয়াল করে। তৃধার লিখনের দিকে তাকানোর দৃষ্টি অভিনয় নয়,একদম পূর্ণার মতো। পূর্ণা যেভাবে তার দিকে তাকায়। ঠিক সেরকম। লিখন তৃধার হাতে ধরতেই তৃধার চোখেমুখে একটা আনন্দ ছিটিয়ে পড়ে। একমাত্র শুটিংই পারে তাকে লিখনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। মৃদুলের শরীরটা কেমন করে উঠে। ভালোবাসার জগতে কত রূপের ভালোবাসা রয়েছে! পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে। মৃদুল লিখনকে না বলেই বেরিয়ে পড়ে। বড়ই গাছের নিচে দুটো খালি চেয়ার পড়ে থাকে। চারিদিকে মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

সকাল সকাল পূর্ণা,প্রেমা,বাসন্তি, প্রান্ত সবাই মিলে হাওলাদার বাড়িতে চলে আসে। সবাই খুব চিন্তিত। তারা নিজের চোখে পদ্মজাকে দেখতে চায়। পদ্মজার গলায় মাফলার পরেছে,যেন গলার দাগ দেখা না যায়। তার ঘরের সামনে একজন লোক সবসময় ঘুরঘুর করছে। আমির পাহারাদার রেখেছে। এছাড়া নজর রাখার জন্য লতিফা তো আছেই। পূর্ণা,প্রেমা ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে আপা' বলে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরলো। পদ্মজা যেন প্রাণ ফিরে পায়। খুশিতে তার চোখে জল চলে আসে। সে দুই বোনের মাথায় চুমু দিয়ে বলে,'আমার বোনেরা।'
পদ্মজার গালের ক্ষতস্থান সবার আগে প্রেমা খেয়াল করলো। সে প্রশ্ন করলো,'আপা,তোমার গালে কী হয়েছে?'

পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে বললো,'ব্যথা পেয়েছি।'
পূর্ণা পদ্মজার ক্ষতস্থান ছুঁয়ে বললো,'আপা,এতোটা কেমন করে হলো? কবে হলো?'
আমির ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ণার জবাব দেয়,'ঢাকা যাওয়ার পথে দূর্ঘটনা ঘটে।'
পদ্মজা আমিরের দিকে তাকালো। রাতের পর আর তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। ফজরে অন্দরমহলে রিদওয়ান নিয়ে এসেছে। আমির পদ্মজার দিকে তাকালো না। সে টেবিলের উপর থেকে একটা কলম তুলে নিল। তারপর 'আসছি' বলে চলে যায়। পদ্মজার মুখে বসিয়ে গেছে,বানানো কথা। পূর্ণা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে,'আপা,দূর্ঘটনা মানে? কেমনে কী হলো?'
পদ্মজার মিথ্যে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। সে বললো,'যা হয়ে গেছে হয়েই গেছে। এখন তো ভালো আছি। দূর্ঘটনা মনে রাখতে নেই। এসব নিয়ে কোনো আলোচনা না।'
পূর্ণার খুব কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজার ফর্সা গালে ক্ষতটা ভেসে আছে। ভয়ানক দেখাচ্ছে। পূর্ণা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজা টের পায় পূর্ণা কাঁদছে। পূর্ণা এত কেন ভালোবাসে! পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,'কাঁদে না। এইটুকুর জন্য কেউ কাঁদে?'
পূর্ণা কান্নামাখা স্বরে বললো,'মনে হচ্ছে,আমি ব্যথা পেয়েছি।'
পদ্মজা পূর্ণাকে সামনে দাঁড় করায়। পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বলে,' আমার কাঁদুনিরে।'
পূর্ণা হাসে,তার সাথে পদ্মজাও হাসে। হাসে প্রেমা,প্রান্ত,বাসন্তি। পদ্মজার পাতালঘরে থাকা মেয়েগুলার কথা মনে পড়ে যায়। সেই মেয়েগুলোরও মা-বোন-বাবাও তো অপেক্ষা করে আছে। আশায় আছে,একদিন তাদের মেয়ে,বোন ঘরে ফিরবে। পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কিছুতেই মেয়েগুলোকে কুরবানি হতে দেওয়া যাবে না। সে তার সবকিছু ত্যাগ করে হলেও বাঁচাবে!

পূর্ণারা দুপুরে চলে যায়। আমির ঘরে আসে। দরজা থেকে পদ্মজাকে বলে,'কারো কাছে কিছু বলার চেষ্টা করবে না। বোনদেরও না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কাউকে কিছু বললে তোমার বোনদের ক্ষতি হবে। বাইরে শান্টু আছে। বাড়ির গেইটেও দুজন আছে। বাইরে থেকে কেউ যেন না আসে। শুধু তোমার পরিবার ছাড়া। বেরোবার চেষ্টা করো না।'
আমির কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ায়। পদ্মজা প্রশ্ন করে,'আম্মার কাছে আমাকে যেতে দেয়া হচ্ছে না কেন? আম্মা অসুস্থ। উনাকে আমি দেখতে চাই।'
'বলে দিচ্ছি,যেতে দিবে।'
'পূর্ণাকে বিয়ে দিতে চাই। খুব দ্রুত। প্রেমাকেও।'
আমির ঘুরে দাঁড়ায়। বললো,'প্রেমাকেও কেন?'
'আমার ভবিষ্যৎ আমি জানি না। হয় জেল নয় মৃত্যু। কিছু একটা হবেই।'
তাৎক্ষণিক আমির কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না। সময় নিয়ে বললো,'মৃদুল আর পূর্ণাকে গতকাল সন্ধ্যায় মেলায় দেখেছি। মৃদুলের সাথে কথা বলতে পারো।'
পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইলো,'সত্যি? কী করছিল?'
'মেলায় কী করতে যায়?'
পদ্মজা বুঝতে পারে। সে বললো,'ছোট ভাই আপনার মতো না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে?'
'মৃদুল আমাদের বংশের না। তাই আমার সাথে নেই। বাইরে কিছু করে নাকি জানি না।'
পদ্মজার জবাব না শুনেই আমির চলে যায়। পদ্মজা ভাবতে বসে। মৃদুল অনেক সুন্দর একটা ছেলে। সে কি পূর্ণাকে সত্যি ভালোবাসে? নাকি এমনি ঘুরতে গিয়েছিল। একটা ছেলেমেয়ে এমনি তো মেলায় ঘুরতে যাবে না। তাদের সমাজ তো এমন নয়। পদ্মজা দৌড়ে বেরিয়ে আসে। আমিরকে ডাকলো,'শুনুন।'

আমির দাঁড়াল। পদ্মজা বললো,'আমি ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই।'
'সন্ধ্যায় কথা হবে। আমার সামনে।'

_____

ফরিনার অবস্থা করুণ। পদ্মজা সব জেনে গেছে জানার পর অসুস্থতা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে দেখে, ফরিনা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পদ্মজা ফরিনার শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকলো,'আম্মা?'
ফরিনার বুক ছ্যাৎ করে উঠলো। তিনি চট করে চোখ খুললেন। চোখ ভরে উঠে জলে। তিনি উঠতে চান,পদ্মজা ধরে। ফরিনা কেঁদে উঠলেন। কেঁদে উঠে পদ্মজাও। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদে। ফরিনা চোখের জল মুছে বললেন,'আজরাইল আমার ঘরে ঘুরতাছে। তোমারে না দেইখা আমি কেমনে মরি কওতো?'
'এসব বলবেন না আম্মা। আমার মা নেই। আপনি আমার মা।'
ফরিনা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন,'এহন আমি শান্তিতে মরতে পারুম। তোমারে আমার অনেক কথা কওনের আছে।'
পদ্মজা ফরিনার এক হাত মুঠোয় নিয়ে ভেজাকণ্ঠে বললো,'আপনার ছেলের সম্পর্কে সব জানি আম্মা। আমার বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়েছে।'
ফরিনায় ঘৃণায় কপাল কুঁচকে ফেললেন। বললেন,'বাবু আমার গর্ভরে কলঙ্কিত করছে।'
'আপনি উত্তেজিত হবেন না আম্মা।'
'আমি তোমারে কইতে গিয়েও কইতে পারি নাই। আমারে মাফ কইরা দেও। তোমার জীবনটা আমার কুলাঙ্গার সন্তানের লাইগগা নষ্ট হইয়া গেছে। ও মা,ওরা তোমারে মারছে?'
'না আম্মা,আমাকে কেউ মারেনি। আপনি শান্ত হোন। আমি চলে এসেছি,আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনার আর কষ্ট হবে না।'
ফরিনা চোখ বড় বড় করে তীব্র ঘৃণা আর রাগ নিয়ে বললেন,'আমি যদি মইরা যাই। তুমি বাবুর বাপের মাথাডা কাইটটা আমার কবরে রাইখা আইবা। আমার আদেশ এইডা। তাইলে আমার আত্মা শান্তি পাইবো।'

ফরিনা ছটফট করছেন। শ্বাস নিচ্ছেন অনেক কষ্টে। রাগে শরীর কাঁপছে। বিছানায় দূর্গন্ধ। চোখ মুখ শুকিয়ে একটু হয়ে গেছে। পদ্মজা দুই হাতে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরলো শান্ত করার জন্য। বলে,'আম্মা,শান্ত হোন। আল্লাহ সব পাপের জন্য শাস্তি আগে থেকেই বরাদ্দ করে রেখেছেন। সবার শাস্তি হবে। হতেই হবে।'
'শুয়ো** বাচ্চা আমার সাথে কী করছে আমি তোমারে কইতে চাই। তুমি হুনো আমার কথা।'
'সব শুনবো আম্মা। সব শুনবো। লতিফা বুবু বললো,খাবার নাকি খাচ্ছেন না। এখন খাবেন। ঔষধ খাবেন,ঘুমাবেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে সব বলবেন। আপনার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কাঁপছেন আপনি। শান্ত হোন আপনি।'

ফরিনা আবোলতাবোল বলতেই থাকেন। মানুষটার মৃত্যু যেন ঘনিয়ে এসেছে। পদ্মজা বিছানা পরিষ্কার করে। ফরিনার শরীর মুছে দেয়। নতুন শাড়ি পরিয়ে খাইয়ে দিল। তারপর জোর করে ঘুম পাড়িয়ে,লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। মানুষটার অতীত কতোটা ভয়ংকর সে জানে না। তবে শুনতে চায়। সবকিছু জেনে বড় কোনো উদ্যোগ নিতে হবে। পদ্মজার নিজের মায়ের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি সবসময় বলতেন "প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করে।" যদি এই কথাটি সত্য হয়। তবে হাওলাদার বংশের শেষ পুরুষদের ধ্বংস করাই তার জন্মের উদ্দেশ্য! সে শতভাগ নিশ্চিত!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭২

_____

সন্ধ্যা নেমেছে কিছুক্ষণ পূর্বে। আজ আকাশ পরিষ্কার। কুয়াশা নামেনি। সন্ধ্যার নামায আদায় করে পদ্মজা নিজ ঘরে বসে আছে। অপেক্ষা করছে মৃদুলের জন্য। নিস্তব্ধতা ভেঙে পায়ের শব্দ ভেসে আসে। আমির ঘরে প্রবেশ করে। পদ্মজার থেকে দূরত্ব রেখে চেয়ারে বসে। তারপর প্রবেশ করলো মৃদুল। মৃদুলের বুক কাঁপছে। সে চিন্তিত। পদ্মজা মৃদুলকে সালাম দিল। তারপর বললো,'বসুন ছোট ভাই।'
মৃদুল বসলো। সে বুঝতে পারছে না কী হতে চলেছে। শঙ্কিত সে। গোপনে ঢোক গিলে একবার আমিরকে আরেকবার পদ্মজাকে দেখলো। পদ্মজা বললো,'কেমন আছেন?'
মৃদুলের অস্বস্তি হচ্ছে। সে দ্রুত জবাব দিল,'ভালো আছি ভাবি। কোনো সমস্যা হইছে?'
'না,কোনো সমস্যা হয়নি। কেমন লাগছে এখানে? খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক হচ্ছে?'
'জি ভাবি,সব ঠিক আছে। ভালো লাগছে। রানি আপার কথা খুব মনে পড়ে।'
পদ্মজা আক্ষেপের স্বরে বললো,'রানি আপা কেন যে এমন করলো! যদি ফিরে আসতো।'
মৃদুল নিরুত্তর। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকালো। আমির নিশ্চুপ। সে এই আলোচনায় যাবে না। পদ্মজা মৃদুলকে বললো,'আacচ্ছা সোজাসুজিভাবেই কথা বলি। পূর্ণার সাথে আপনার সম্পর্কটা কী?'
পদ্মজার প্রশ্ন শুনে মৃদুলের দম গলায় এসে আটকে যায়। সামনে বড় ভাই আমির হাওলাদার। যাকে সে ভয় পায়। প্রশ্ন করছে,পূর্ণার বড় বোন। যে বোনকে পূর্ণা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আর ভালোবাসে। এমন পরিস্থিতিতে যারা পড়েছে তারাই বুঝবে তখন কেমন অনুভূতি হয়। মৃদুলকে চুপ করে থাকতে দেখে পদ্মজা বললো,'বলুন ছোট ভাই।'
মৃদুল বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ছাড়ল। তারপর বললো,'কোনো নাম নাই। আমি পূর্ণারে পছন্দ করি। আর পূর্ণা আমারে।'

পদ্মজার বুক থেকে ভারি বোঝাটা নেমে যায়। মৃদুল এক প্রশ্নে সত্য কথা বলতে পেরেছে ভেবে আনন্দ হচ্ছে। কথাবার্তা বাড়ানো সম্ভব নয়। হাতে সময় নেই। তাই সে নড়েচড়ে বসে বললো,' আপনি বা আপনার পরিবার বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন? পূর্ণাকে বিয়ে করতে চান?'
মৃদুল আবারো আমির-পদ্মজাকে দেখলো। আমির তার দিকে এক ধ্যাণে তাকিয়ে আছে। সে নীরব দর্শক। মৃদুল বুঝতে পারছে না,কীভাবে জবাব দিলে ভদ্র দেখাবে। প্রেমিকার অভিভাবকের সাথে কথা বলার জন্য আলাদা কলিজা লাগে! মৃদুল এক হাতে মাথা চুলকাল। পদ্মজার কেন যেন হাসি পায়। কিন্তু চোখেমুখে গাম্ভীর্য ধরে রাখে। এই মুহূর্তে সে পাত্রীর অভিভাবক! মৃদুল ধীরেসুস্থে বললো,'আম্মা,আব্বা অনেকদিন ধরেই বিয়ের কথা বলতাছে। আমি রাজি ছিলাম না। এখন রাজি আছি।'
পদ্মজা মৃদুলকে আগাগোড়া পরখ করে নিয়ে বললো,'বিয়ের ক্ষেত্রে গায়ের রঙ নিয়ে আপনার মতামত কী?'

Kobitor.com

প্রশ্ন শুনে মৃদুল থতমত খেয়ে গেল। মনে হচ্ছে,সে পরীক্ষা দিতে এসেছে। মেট্রিক পরীক্ষায় যা পারেনি, লিখেনি। চুপচাপ বসে সময় গুণেছে কখন ছুটি হবে। কিন্তু এখন তো জিততেই হবে। জীবন মরণের প্রশ্ন! সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল! মৃদুল মুখখানা একটুখানি করে বললো,' জানি না ভাবি। আমার চোখে আগে কালা-সাদার ভেদাভেদ ছিল। কিন্তু এখন নাই। কেন নাই,জানি না। হুট করেই মনে হইতাছে,চামড়ায় যায় আসে না। মনের টানটা আসল। যারে ভালোবাসা যায় তার সবকিছুই ভালোবাসা যায়। সব কিছুর উপরে ভালোবাসা। ভালোবাসার সামনে সবকিছু তুচ্ছ।'
মৃদুলের কথা শুনে পদ্মজার বুকটা কেমন করে উঠে। সে আড়চোখে আমিরের দিকে তাকালো। আমিরও আড়চোখে তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হতেই আমির উঠে চলে যায়। মৃদুল ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। বললো,'ভাবি ভুল কিছু কইছি? ভাই রাগ কইরা চলে গেল?'
পদ্মজা লুকানো যন্ত্রণা হজম করে নিয়ে বললো,'ভালো কথা বলেছেন। আমি কথা বাড়াব না। পূর্ণাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলে,দ্রুত নিজের বাড়ি ফিরে যান। অভিভাবক নিয়ে আসুন। আমি আমার বোনকে বিয়ে দেব। আপনার পরিবার রাজি থাকলে আমার আপত্তি নেই। আমার বোন আমার দায়িত্বে। আমি চাই না সে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে দীর্ঘদিন থাকুক। আশা করি দ্রুত সবকিছু হবে।'

মৃদুল খুব অবাক হয়। সে ভেবেছিল,পদ্মজা রাজি হবে না। তাকে রাজি করাতে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হবে। কিন্তু পদ্মজা তো রাজি। মৃদুলের
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হতে থাকে। সকালে কোন সৌভাগ্যবানের মুখ দেখে উঠেছিল মনে করতে পারলে, সে তাকে একটা খাসি দিবে বলে ভাবে। মৃদুল চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পদ্মজাকে সালাম করতে ঝুঁকলো। পদ্মজা আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায়। সে দ্রুত বিছানার উপর পা তুলে ফেললো। আর বললো,'আসতাগফিরুল্লাহ! ছোট ভাই আপনি আমার বড়।'
মৃদুল আনন্দে আত্মহারা। তার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা কাজ করছে। কী করবে না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এতো দ্রুত হুট করে এমন সুন্দর প্রস্তাব পাবে,সে ভাবেনি। ঠোঁটে হাসি রেখে বললো,'আমি শনিবারেই বাড়িত যামু। রবিবারেই আম্মা,আব্বারে নিয়া আসব। আপনি চিন্তা কইরেন না।'
মৃদুলের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। সে ভীষণ উত্তেজিত বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা পানি খেতে বললো। মৃদুল পানি পান করে। তারপর বললো,'আসি ভাবি?'
'যান। আল্লাহ আপনার ভালো করুক।'

মৃদুল তাড়াহুড়ো পায়ে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাসে। মৃদুল একদম পূর্ণার মতো। ছটফটে, চঞ্চল। আমির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। পদ্মজাকে হাসতে দেখে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়ায়। দূর আকাশে চোখ রেখে কী যেন ভাবে। তখন রিদওয়ান আসে। আমিরকে জানায়,'শুক্রবারে সমাবেশ হচ্ছে না।'
আমির প্রশ্ন করলো,'কেন?'
'শীতের কাপড় এখনো আসেনি। কালদিন পরই শুক্রবার।'
'আব্বার কাজই এমন। ভাগ্য ভালো গ্রামবাসীকে আগে দাওয়াত দেয়া হয়নি। শুধু চেয়ারম্যানদের দেয়া হয়েছিল। সমাবেশ যে হচ্ছে না তাদের জানানো হয়েছে ?'
'হয়েছে। তুই কি আমার সাথে বের হবি?'
'আমি অন্যদিকে যাব।'

'রাতের ঘটনা শুনলাম। আরভিদের লাশটা কী করা হয়েছে?'
'যা করা হয় তাই করা হয়েছে। বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সম্ভব হয়নি।'
'আমি ঘুমে না থাকলে এমন কিছুই হতো না।'
আমিরের মেজাজ বিগড়ে যায়। বললো,'তো ঘুমালি কেন?'
'তুই বউয়ের প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাদের দলের একজন বিশ্বস্ত,শক্তিশালীকে হারালি।'
আমির কিছু বললো না। রিদওয়ান বললো,'পদ্মজার বুকেও ডরভয় নাই। সব তোর দোষ!'
আমির ক্রোধ নিয়ে বললো,"আমার সাথে গলা উঁচিয়ে কথা বলবি না।'
'কী করবি? মারবি? মার।'
আমির দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কিড়মিড় করে বললো,'রিদওয়ান! মুখ নিয়ন্ত্রণ কর। নয়তো বিছানায় না, সোজা কবরে যাবি। পুরনো প্রতিশোধ
নিয়ে নেব।'
রিদওয়ান আমিরের দিকে অগ্নি দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। আমির গ্রিল খামচে ধরে। তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। রেগে গেলেই তার কপাল ঘামে!

ফরিনার ঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। মজিদ হাওলাদার আলাদা থাকেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে আগে হারিকেন জ্বালাল। বিছানার এক কোণে রেখে ফরিনার পাশে বসলো। ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। নিশ্বাস নিচ্ছেন ঘন ঘন। দেখে মনে হচ্ছে,কেউ রূহর গলা চেপে ধরে রেখেছে। ফরিনা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছেন। পদ্মজার বুকটা ব্যথায় ভরে উঠে। সে ফরিনার চুলে বিলি কেটে দেয়। আরেক হাতে ফরিনার এক হাত শক্ত করে ধরে। হাত দুটো নিস্তেজ,নরম! যেন মরে গেছে। পদ্মজার কষ্ট হয়। মনে পড়ে প্রথম হাওলাদার বাড়িতে প্রবেশ করার কথা। কত মানুষ ছিল। লাবণ্য বিলেত পড়তে চলে গেল। শুনেছে,লাবণ্য বিলেতের এক ছেলেকে বিয়ে করতে চলেছে। আমির অনুমতি দিয়েছে। ফরিনা কষ্ট পেয়েছেন। রানি আপা কোথাও চলে গেল কে জানে! কষ্টের পরিমাণ কতোটা বেশি হলে একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়? মদনকে আজ সারাদিন দেখা যায়নি। কোথায় সে? ফরিনা চোখ খুললেন। পদ্মজাকে দেখে মৃদু হাসলেন। পদ্মজা বললো,'কেমন আছেন আম্মা? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'
ফরিনা পদ্মজার এক হাত ধরে বললো,'তুমি আইছো মা।'
'আসছি আম্মা। কিছু লাগবে?'
ফরিনার কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। সারা শরীরে আগুন পুড়ানো জ্বালাপোড়া। ঘরটাকে মৃত্যুপুরী মনে হয়। পৃথিবী তাকে আর রাখতে চাইছে না। ঠেলে যেন সরিয়ে দিচ্ছে অজানা জগতে। তিনি সময় নিয়ে বললেন,'কিছু লাগব না মা। তুমি আমার ধারে থাহো।'
পদ্মজা ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,'আছি আম্মা। আছি আমি।'
ফরিনা হারিকেনের নিভু আলোয় পুরো ঘরটাকে দেখলেন। পদ্মজাকে দেখলেন। আচমকা ডান পা বিরতিহীন কাঁপতে থাকে। তিনি পদ্মজার শাড়ি খামচে ধরে ভয়ার্ত স্বরে বললেন,'আমারে নিয়া যাইতাছে। আমারে ধরো পদ্মজা। আমারে ধরো। আমারে নিয়া যাইতাছে। যা,যা এখান থেকে যা।'
তিনি কাঁদতে থাকেন। পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। এক হাতে ফরিনার ডান পা চেপে ধরে। ধীরে ধীরে কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। পদ্মজা দ্রুত ফরিনাকে পানি পান করালো। তারপর বললো,'কিছু হয়নি আম্মা। কেউ নেই এখানে। আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন।'
ফরিনা ভীত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,'কেউ নাই!'
'না নেই। ঘুমানোর চেষ্টা করুন আম্মা।'

ফরিনা পদ্মজার দুই হাত আঁকড়ে ধরে চোখ বুজেন। পদ্মজা ছাড়া মানুষটার কেউ নেই। তিনি পদ্মজাকে কতোটা বিশ্বাস করেন,ভরসা করেন সেটা হাত ধরে রাখা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

বসে থাকতে থাকতে পদ্মজার চোখ দুটি লেগে আসে। তখন ফরিনা চোখ খুলে বললেন,'আমার আম্মার নাম ফুলবানু আছিল। রামপুরার ছেড়ি।'
পদ্মজার ঘুম ছেড়ে যায়। সে নড়েচড়ে বসে। আরো একটি জীবনের গোপন অধ্যায়ের স্বাক্ষী হতে চলেছে পদ্মজা। ফরিনার চোখের দৃষ্টি ছাদে। তারা দুজন ছাড়া কোথাও কেউ নেই। বাইরে থেকে শেয়ালের হাঁক ভেসে আসছে।

_____
ফুলবানু দেখতে সুন্দর ছিল বলে তার নাম ফুলবানু হয়। ফুলবানুর মা মারা যায়,যখন ফুলবানুর বয়স ছয়। বাবার আদরেই বড় হয়। যখন ফুলবানুর চৌদ্দ বছর বয়স তখন বনেদি এক পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। তাদের যৌতুকের চাহিদা অনেক। তাও ফুলবানুর বাবা রাজি ছিলেন। জমিজমা,গরু-ছাগল বেঁচে মেয়ের বিয়ে দিলেন। একটাই যে মেয়ে ছিল। মেয়ের সুখই সব। ফুলবানুর সংসার দুই মাসের বেশি ভালো যায়নি। স্বামী চাপ দেয়,যৌতুকের জন্য। ফুলবানু সে খবর তার বাবার কাছে পাঠায়। ফুলবানুর বাবা শেষ সম্বল বাড়িটিও বিক্রি করে দেন। মেয়েকে সুখী করে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বেছে নেন অনিশ্চিত জীবন। মানুষটার খবর আর পায়নি ফুলবানু। বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে সে জানে না। বিয়ের বছর খানেকের মাথায় জন্ম হয় ফরিনার। ফুলবানুর শ্বশুরবাড়ি অপেক্ষায় ছিল,ছেলের আশায়। মেয়ে দেখে তারা কপাল কুঁচকায়। এদিকে ফুলবানুর স্বামীর সম্পর্ক হয়েছে আরেক বনেদি ঘরের মেয়ের সাথে। যার বয়স ফুলবানুর স্বামীর চেয়েও বেশি। মেয়ে জন্ম দেয়ার অপরাধে ফুলবানুকে সহ ফরিনাকে রাস্তায় ফেলে দেয় তারা। ফুলবানুর স্বামী বিয়ে করে বনেদি ঘরের সেই মেয়েকে। যৌতুক দিয়ে ভরিয়ে দেয় ঘর! সেখানে এতিম ফুলবানুর জায়গা হয়নি কিছুতেই। রাস্তায় কত অমানুষ ছিঁড়ে খায় তাকে। তবুও রক্তাক্ত অবস্থায় ফুলবানু ধরে রাখে তার আদরের একমাত্র কন্যা ফরিনাকে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অলন্দপুরের বাজার বেছে নেয় ফুলবানু। এক পাগলির মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে ফরিনা। বয়স বাড়তে বাড়তে বারোতে এসে ঠেকে। সেই সময়ে এক চন্দ্রহীন রাতে মজিদের শিকার হয় ফরিনা।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৩
_____
ঘোর অন্ধকারে ফরিনাকে নিয়ে আসা হয় পাতালঘরে। ছোট ফরিনা মুক্তির জন্য ছটফট করে। মজিদ তখন টগবগে যুবক। তার একেকটা থাবা ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মতো। ফরিনার ছোট্ট শরীর নির্মমভাবে কলুষিত হয়। রক্তাক্ত ফরিনা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে পাতালঘরে। এরপরদিন চোখ খুলে মজিদের সাথে খলিলকে দেখতে পায়। আশেপাশে কয়েকজন পুরুষ ছিল। বাঁধা অবস্থায় ছিল চারটে মেয়ে। ফরিনার চোখের সামনে চারটা মেয়েকে বিভৎস ধর্ষণ করা হয়। ফরিনা ভয়ে কাঁপতে থাকে। সারা শরীরের ব্যথা ভুলে যায়। নৃশংসতার এই তাণ্ডব শেষ হওয়ার পর মজিদ ফরিনার কাছে আসে। তখন খলিল ফরিনাকে দেখে বললো,'ভাই,এই ছেড়ি তো ফুলবানুর।'
মজিদ প্রশ্ন করে,'কোন ফুলবানু?'

Kobitor.com

'বাজারের পাগলিডা যে।'

হাওলাদার বাড়ির ছেলেরা ছেলে সন্তানের জন্য খুঁজে, খুঁজে অসহায় মেয়েদের বিয়ে করে। যাতে কখনো মুখের উপর কথা না বলতে পারে। সব জানা সত্ত্বেও চুপচাপ সব মেনে নেয়। সে মেয়ে সুন্দর হউক অথবা কুৎসিত। তাতে যায় আসে না। ছেলে সন্তানটাই আসল। গরীব,অসহায় মেয়েদের হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা বিয়ে করে ঘরে তুলে বলে চারপাশে তাদের অনেক নাম। অথচ,কেউ জানে না ভেতরের খবর! কেউ জানে না ভালোমানুষির পিছনের নোংরা গল্প! চতুর মজিদ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়,ফরিনাকে বিয়ে করবে। এমন মেয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফরিনার পরিবার বলতে কিছু নেই। মা আছে সেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পথেঘাটে ঘুরে। সুন্দর অনেক মেয়ের সঙ্গ তো প্রতিদিনই পাওয়া যায়। সমাজের চোখে বউ একজন হলেই হলো। মজিদের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে ফরিনাকে অন্দরমহলে নিয়ে আসে।
পূর্বে মজিদের একটা বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেনি। মজিদের পাপের পথের বিষধর কাঁটা হওয়ার ফলে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। খলিলের বউ আমিনা তখন গর্ভবতী। আমিনার বয়স ছিল পনেরো। মজিদ ফুলবানুকেও অন্দরমহলে নিয়ে আসে। ফুলবানু আর মজিদের বয়স কাছাকাছি ছিল। মজিদ যখন প্রস্তাব দিল,বোকা,সরল-সহজ ফুলবানু খুব খুশি হয়। তার মেয়ে এত বড় বাড়িতে রানির হালে থাকবে। তাকেও থাকতে দিবে এর চেয়ে খুশির কী হতে পারে? মজিদের মাতা নূরজাহান বিয়ের প্রস্তুতি নেন। বাড়িতে মজিদ-খলিলের অভিভাবক বলতে তিনি ছিলেন। তার স্বামী অষ্টাদশী এক তরুণীর সতীত্ব হরণ করতে গিয়ে সেই তরুণীর হাতে নিহত হয়। ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন হয় বিয়ে। অলন্দপুর সহ আশেপাশের সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে মজিদ হাওলাদারের নাম। বনেদি ঘরের শিক্ষিত পাত্র হয়ে বিয়ে করেছে এক অসহায় পাগলির মেয়েকে! সবার মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভরে উঠে। বিয়ের রাতে ফরিনা দ্বিতীয়বারের মতো মানুষরূপী যমদূতের দেখা পায়। শরীরে ছোপ,ছোপ দাগ বসে। বিছানায় পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়,মজিদের অত্যাচারে আবার শয্যা গ্রহণ করে। ফরিনার এত দূর্বলতায় মজিদ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ক্রোধে ফেটে পড়ে সে। তার বিকৃত মস্তিষ্ক ফরিনাকে নগ্ন করে পিটানোর আহ্বান জানায়। মজিদ তাই করে। সে দৃশ্য চোখে পড়ে ফুলবানুর। গগণ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠে। সেই চিৎকার ফুলবানুর জীবনের মরণ কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। মজিদের হাতে বন্দি হয় সে। ফরিনার ঘরে তাকে বেঁধে রাখা হয়। তখন বিছানায় ফরিনা রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। অস্পষ্ট স্বরে 'আম্মা,আম্মা' বলে চুপ হয়ে যায়। ফুলবানু চিৎকার করে মানুষজনকে ডাকে। কেউ শুনেনি তার চিৎকার। ফরিনাকে গলা ফাটিয়ে ডাকে,'ফরিনারে,ও মা
একটু দেখ আমারে...আম্মারে।'

নূরজাহান, আমিনা সব শুনেও নিজেদের ঘরে শুয়ে থাকে। আমিনা ভালো বংশের মেয়ে। তাকে বিয়ে করার কারণ,সে মৃগী রোগী। আর খুব ভীতু প্রকৃতির। আমিনার পিতা প্রভাবশালী। গ্রাম্য রাজনীতি সাহায্যের জন্য হাওলাদারদের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান আত্মীয় প্রয়োজন ছিল। আমিনার আরো বোন ছিল। সুস্থ,সুন্দর। কিন্তু মজিদ খলিলের জন্য পছন্দ করেছে রোগী,ভীতু প্রকৃতির মেয়ে আমিনাকে। ফরিনাকে সুস্থ করার জন্য ফুলবানুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এক ঘরে বন্দি রাখা হয়। কেটে যায় তিন-চার দিন। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। ফুলবানু ফরিনার মুখ ছুঁয়ে আদর করে আর বলে,'আমার আম্মা!'
ফরিনা ঠোঁট ভেঙে কেঁদে মায়ের কাছে অভিযোগ করে,'আমারে অনেক মারে আম্মা। আমারে লইয়া যাও। আমি এইহানে থাকুম না।'

ফুলবানুর চোখ বেয়ে জল পড়ে। দুই হাতে মাথা চুলকায়। ফরিনা তাকে নদীর পাড়ে নিয়ে গোসল করিয়ে দিতো। কেউ খাবার দিলে ফরিনা তার মাকে খাইয়ে দিতো,নিজেও খেতো। যাযাবর জীবনে ফরিনার দায়িত্বে ছিল তার মা। ফুলবানু সবকিছুতে শূন্য দেখে। শুধু বুঝতে পারে,তার মেয়েকে একজন লোক অত্যাচার করে। মনে হতেই,ফুলবানুর দৃষ্টি অস্থির হয়ে পড়ে বার বার। এলোমেলোভাবে হাত পা নাড়াতে থাকে।
দরজা খট করে শব্দ হয়। মজিদ ঘরে প্রবেশ করে। ফুলবানু তেড়ে এসে মজিদের চুল টেনে ধরে,বাহুতে দাঁত বসিয়ে দেয়। মজিদ আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায়। আর্তনাদ করে উঠে। ফুলবানুর চুল শক্ত করে ধরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। ফুলবানু মেঝেতে পড়তেই,শব্দ হয়। ফরিনা কাঁদতে শুরু করে। ফুলবানু আবার উঠে দাঁড়ায়। রাগে সে কিড়মিড় করছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছে। ফুলবানু কাছে আসতেই মজিদ ফুলবানুর তলপেটে লাথি দেয়। ফুলবানু ছিটকে পড়ে। গোঙাতে থাকলো। ফরিনা ভয়ে জড়সড়! সে কাঁদতে কাঁদতে মজিদকে অনুরোধ করলো,'আমার আম্মারে মাইরেন না।আপনে আমার আম্মারে মাইরেন না। আমার আম্মায় কিচ্ছু বুঝে না।'

মজিদ পালঙ্কের নীচ থেকে দড়ি নিয়ে ফরিনার হাতপা বাঁধে। ফুলবানু নতুন উদ্যমে আবার ছুটে আসে। সে মজিদকে খুন করতে চায়। কিন্তু দূর্বল,বোকা ফুলবানু পেরে উঠেনি মজিদের সাথে। মজিদ ফুলবানুর শরীরের প্রতিটি লোমকূপকে নির্মমভাবে আঘাত করে। খামচে ধরে। তারপর দুই হাতে ফুলবানুর চুল ধরে মেঝেতে আঘাত করে কয়েকবার। ফুলবানুর মাথা থেকে রক্ত ছিটকে পড়ে চারপাশে। ফরিনার চিৎকার বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সাথে হারিয়ে যায়। থেমে যায় ফুলবানুর অভিশপ্ত যাযাবর জীবন। ফরিনার কণ্ঠনালি স্তব্ধ হয়ে যায়। এই জীবনে ভয়ংকর বলতে তার আর কিছু দেখার নেই। রাত শেষে দিন আসে। ফুলবানুর দেহ ভেসে যায় কোনো এক নদীর স্রোতে।
ফুলবানুর নির্মম মৃত্যু ফরিনার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে মিশে যায়। যত বার নিঃশ্বাস নেয় ততবার মনে পড়ে মায়ের কথা। মায়ের মৃত্যুর কথা। ছোট ফরিনা বুকের ভেতর মায়ের স্মৃতি লুকিয়ে রেখে মজিদের দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। দাসত্ব জীবনে বার বার হয়েছে অত্যাচারিত। ব্যথায় মলম লাগিয়ে দেওয়ার জন্যও কেউ ছিল না। একা কাটিয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত। বিয়ের চার বছরের শেষদিকে কোল আলো করে আসে পুত্র সন্তান। ফরিনা জীবনে আনন্দ খুঁজে পায়। যখন তার পুত্র সন্তানের দুই বছর তখন ফরিনা ভাবে,সে তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিবে। হুট করেই বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠে। সুযোগ আসে মজিদকে হত্যা করার। ফরিনা রাম দা হাতে তুলে নেয়। দূর্ভাগ্যবশত মজিদ টের পেয়ে যায়। সে ফরিনাকে খলিল, নূরজাহান, আমিনা সবার সামনে নগ্ন করে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফরিনা দুই হাতে দেয়াল খামচায়। যেন দেয়াল ছুটে এসে তার কাপড় হয়। তার লজ্জা ঢেকে দেয়। কিন্তু অসম্ভব ঘটনাটা ঘটেনি।
ফরিনা হার মেনে নেয়। সহ্য করে নেয় সব। তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বুকের মণিকোঠায় রক্তাক্ত তাজা অবস্থায় রয়ে যায়,তার মায়ের মৃত্যু।

_____

ফরিনা দুই চোখ বুজে। গড়িয়ে পড়ে দুই ফোঁটা জল। ফরিনার বলা প্রতিটি কথা গুমরে, গুমরে যেন দেয়ালে বারি খাচ্ছে। সেই শব্দে পদ্মজার মাথা ভনভন করছে। তার চোখের জল বুক অবধি নেমে এসেছে। সে অনুভব করে,তার বুকের ভেতর ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সে অন্য সত্তায় অবস্থান করছে। চোখের জল মুছে ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বললো,'কথা দিচ্ছি,মজিদ হাওলাদারের মাথা আমি আপনার নামে উৎসর্গ করব।'

Kobitor.com

ফরিনা পদ্মজার হাতে চুমু দেন। তিনি এখন ভোরের শিশিরের মতো শীতল। নিজের ভেতরের সবটুকু রাগ,ক্ষোভ,আগুন ঢেলে দিয়েছেন পদ্মজার ভেতর। এবার বোধহয় মুক্তির পালা। ফরিনা পদ্মজার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,'তোমার মুখটারে আমার জান্নাতের সুবাসের লাহান মিষ্টি মনে অয়।'
পদ্মজা ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে বললো,' আপনি আমার আরেক মা। আমার আরেক বেহেশত।'
ফরিনা হাসলেন। পদ্মজা বললো,'আজ থেকে আপনার সব দায়িত্ব আমার। আপনাকে সুখে রাখার দায়িত্ব আমার। আমি আপনার সব চাওয়া পূরণ করব।'
ফরিনা হাসলেন। ধীরে ধীরে বললেন,'আমি পাপী। ধর্ম নিয়া আমার শিক্ষা আছিলো না। তুমি আমারে শিখাইছো। শেষ দিনগুলা তোমার কথামত ইবাদাত(এবাদত) করছি।যদি আল্লাহ কবুল কইরা আমার নামে জান্নাত কইরা রাহে,দরজার সামনে তোমার লাইগগা খাড়ায়া থাকাম।'
ফরিনার কথাগুলো পদ্মজার বুকে তীরের মতো আঘাত হাঁনে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। সে দুই হাতে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে বললো,'কেন এসব বলছেন আম্মা!'
'আমার ধারে আমার লগে ঘুমাও মা।'
পদ্মজা ফরিনার পাশে শুয়ে পড়ে। ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করে। মাথায় হাজারটা ভাবনা,অনেক ক্ষোভ,ঘৃণা। এতসব নিয়ে কি ঘুম আসে? দীর্ঘসময় পর তার চোখ দুটি বন্ধ হয়।

এরপরদিন সারাদিন ফরিনা কথা বলেননি। খাবারও খাননি। বাড়ির কোনো পুরুষই বাড়িতে ছিল না। রাতে পদ্মজা শুতে আসে। ফরিনা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে একবার শুধু হাসেন। পদ্মজা দুরুদুরু বুক নিয়ে চোখ বুজে। কিছু মুহূর্ত পার হতেই দ্বিতীবারের মতো আরেক মায়ের মৃত্যুর স্বাক্ষী হয়। ধাপড়ানোর শব্দ শুনে পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। ফরিনার শরীর কাঁপছে। মাথার কাছে হারিকেনের আলো নিভে যাওয়ার পথে। পদ্মজা,ফরিনা আর অদৃশ্য আজরাইল ছাড়া ঘরে কেউ নেই। পদ্মজার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। সে ফরিনার এক হাত চেপে ধরে। কালিমা শাহাদাত পড়তে থাকে। পদ্মজার মুখে উচ্চারিত,"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" স্বরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তার কথা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কাছেই ফিরে যেতে হচ্ছে। পদ্মজার সাথে সাথে ফরিনাও উচ্চারণ করেন। তারপর পরই দেহ ছেড়ে পাড়ি জমান দূর-দূরান্তে! পদ্মজা আম্মা ডেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। ফরিনার প্রাণহীন দেহটার উপর আছড়ে পড়ে বললো,'আপনিও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন আম্মা!'

আমির সবেমাত্র বাড়িতে প্রবেশ করেছে। পানি পান করছিল। পদ্মজার কান্না কানে ভেসে আসতেই সে গ্লাস রেখে উল্কার গতিতে ছুটে আসে। মজিদের ঘুম ভেঙে যায়। পদ্মজার কান্না শুনে তিনি অবাক হলেন। আমিরতো পদ্মজাকে মারবে না। তাহলে এ মেয়ে এভাবে কাঁদে কেন? তিনি চশমা পরে ঘর থেকে বের হোন। আমিনা নিজ ঘরে চুপ করে বসে আছে। ভূমিকম্প হয়ে গেলেও তিনি বের হবেন না। খলিল,রিদওয়ান বাইরে। লতিফা,রিনু হারিকেন জ্বালিয়ে দৌড়ে আসে। বিদ্যুত নেই বিকেল থেকে। আমির ঘরে প্রবেশ করে চমকে যায়। পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। আমির ফরিনার পাশে এসে দাঁড়ায়। আলতো করে ছুঁয়ে ডাকলো,'আম্মা?'
ফরিনার সাড়া নেই। আমিরের মস্তিষ্কে যখন বুঝতে পারে,তার মা বেঁচে নেই,সে স্তব্ধ হয়ে যায়। চারপাশ থমকে যায়। মজিদ ঘরে এসে প্রবেশ করতেই আমির তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার রক্তবর্ণ চোখ দুটি বেয়ে জল পড়ছে। সে রাগে কাঁপতে থাকে। মজিদকে এলোপাথাড়ি ঘুষি দিল। তারপর গলা চেপে ধরে বললো,'কুত্তার বাচ্চা,আম্মার উপর হাত তুলতে না করছিলাম।'

পদ্মজার উপর নজর রাখা দুজন ব্যক্তি আমিরকে জাপটে ধরে। আমিরের মুখ থেকে নির্গত হতে থাকে বিশ্রী গালিগালাজ। মজিদের চোখ ফুলে গেছে। নাক দিয়ে রক্তের স্রোত নেমেছে। তিনি বিস্ফোরিত নয়নে চেয়ে আছেন। আমির কখনো তার সাথে এমন করেনি!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৪

_____
কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। সময় তার মতো করে সবাইকে নিয়ে ছুটে বেড়ায়। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দুইদিন। মজিদ আলগ ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। দুপুর অবধি বাড়িভর্তি মানুষ ছিল। মোড়ল বাড়ির সবাই ছিল। কিছুক্ষণ হলো সবাই নিজেদের বাড়ি ফিরেছে। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ। আমিরের শক্ত হাতের চাপ তার গায়েও পড়েছে, তা মানতে পারছেন না। বিপদের আশঙ্কায় মাথা দপদপ করছে।
বাড়িতে আসা অনেকে প্রশ্ন করেছে,মুখে কী হয়েছে? মজিদ তখন লজ্জা নিয়ে জবাব দিয়েছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া যুক্তিগত আর কোনো অজুহাত তিনি খুঁজে পাননি। অনেকে মজিদকে সন্দিহান চোখে দেখেছে। মজিদ চেয়ার এক হাতে খামচে ধরেন। রাগে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সেখানে
খলিল উপস্থিত হয়। মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খ্যাঁক করে কাশেন। মজিদ তাকালেন না। খলিল বললেন,'ভাই,সমাবেশের কী করন?'
'রবিবারের দাওয়াত দিবি। ফরিনার জন্য দোয়া চেয়ে নেব সবার কাছে। এখন ভালো সময়।'
'আইচ্ছা। ভাই?'
মজিদ তাকালেন। খলিল বললেন,'ছেড়িগুলারে কবে পাডাইবা?'
'আরো তো ছয়টা মেয়ে বাকি। কবে পাঠাবে,আমির জানে। ওর সাথে কথা বল।'
'তোমার ছেড়ার লগে আমি কথা কইতে পারতাম না।' খলিল ঘোর আপত্তি জানালো।
মজিদ আড়চোখে খলিলকে দেখলেন। দৃষ্টিতে অনেক রাগ। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করলেন,'রিদওয়ান কোথায়?'
'বাজারে।'
'আচ্ছা,যা। '
খলিল জায়গা ত্যাগ করেন। মজিদ এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে ভাবেন,আমিরের মনে কী চলছে? কেন তার চোখের দৃষ্টি দুইরকম! এভাবে চলতে থাকলে, হাওলাদার বংশে দূর্যোগ নেমে আসবে।

_____
বাইরে মোলায়েম ঠান্ডা বাতাস। পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশ। পদ্মজা শাল দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। সে ধীর পায়ে হেঁটে আসছে। পিছনে দুজন লোক। ফরিনার ঘরের সামনে এসে থমকে যায় পদ্মজা। পালঙ্কে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে আছে আমির। এক হাঁটুতে এক হাত রাখা। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে তার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো নড়ছে। কারো উপস্থিতি টের পেয়ে আমির চোখ তুলে তাকাল। পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,'অথচ আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। অন্যের মা তো! তাই না?'

আমির চোখ সরিয়ে নিলো। পদ্মজা বললো,'যে মেয়েগুলোকে শিকার করেন, সে মেয়েগুলোর মায়েদের এরকমই কষ্ট হয়! আমি অবাক হচ্ছি, আপনি আম্মার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন দেখে!'
'কথা শোনাতে এসেছো?'
পদ্মজা হাসলো। বললো,'যখন আম্মা দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলো, তখন কোথায় ছিলেন? কেন তাকে শান্তির দেখা দেননি? ছেলে হিসেবে কী করেছেন? উল্টো কষ্ট দিয়েছেন।'
'আম্মা আমার সম্পর্কে কিছু জানতোই না। কষ্ট পাবে কেন? '
'তিনি কখন জেনেছেন সব?'
আমির নিরুত্তর। পদ্মজা উৎসুক হয়ে রইলো। আমির বেশ খানিকক্ষণ পর বললো,'যেদিন বাড়িতে এসেছি। সেদিন রাতে।'
পদ্মজার কপালে ভাঁজ পড়ে। সে প্রশ্ন করলো,'যেদিন আম্মা আমাদের ওই বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিল, সেদিন?'
'হুম।' আমির জবাব দিল ছোট করে।
'কীভাবে জেনেছে?'
আমির বিরক্তি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকালো। বললো,'এত প্রশ্ন করো কেন?'
'আমি জানতে চাই।'
'জেনে কী হবে? আম্মা আমাকে থাপ্পড় তো কম দেয়নি! আমি চুপ করে সহ্য করেছি। আম্মাকে কিছু বলিনি। তাহলে আমি কী করে কষ্ট দিয়েছি?'
আমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'আপনি এই পাপের সাথে জড়িত সেটা আম্মা এতদিনেও বুঝেনি কেন? কীভাবে লুকিয়ে রেখেছেন?'
আমির চট করে উঠে দাঁড়ায়। মনের সবটুকু রাগ পালঙ্কে লাথি মেরে মিটিয়ে নেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। পদ্মজারও রাগ হয় খুব। সে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আলমারি খুলে ছুরি নিলো। আমির ঘর থেকে সব ছুরি সরিয়ে দিয়েছিল। মানুষের ভীড়ে পদ্মজা মজিদের ঘর থেকে দুটো ছুরি সংগ্রহ করেছে। সতর্কতার সাথে একটা ছুরি শরীরের ভাঁজে রেখে দিলো পদ্মজা। আলমারির কপাট লাগাতে গেলেই একটা চিঠি মেঝেতে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটি তুললো। পূর্ণা সকালে দিয়েছে। আলমগীর পদ্মজার নামে মোড়ল বাড়িতে এই চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠির খামের উপর লেখা, "পদ্মজা ছাড়া অন্য কারো চিঠি পড়া নিষেধ।"
তাই পূর্ণা অথবা প্রেমা কেউ পড়েনি। পূর্ণার মনে হয়েছিল এটা গোপনীয় চিঠি। তাই সে লুকিয়ে পদ্মজাকে দিয়েছে। পদ্মজা এখনো পড়েনি। সে যত্ন করে রেখে দেয়। সময় বুঝে পড়বে।

আমির তৃতীয় তলার একটা ঘরে এসে বসলো। তার নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। এক হাত কাঁপছে। যখন সে নিজের সত্তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার পা অথবা হাত কাঁপে। আমির জানালার বাইরে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা দেয়ালে নিজের কপাল দিয়ে আঘাত করে। তিন বারের সময় কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে।
চোখ দুটি ছোট ছোট হয়ে যায়। তার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। শরীর অসাড় হয়ে পড়ে। তবুও জ্ঞান হারায়নি। দূর্বল হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে থাকে মেঝেতে।

_____
মৃদুল মোড়ল বাড়ির পথে দাঁড়িয়ে আছে। তার আজ বাড়ি ফেরার কথা ছিল। অনেকদিন ধরে অলন্দপুরে সে মেহমান হয়ে আছে। ছোটবেলা একবার চার মাস হাওলাদার বাড়িতে ছিল। তারপর আর থাকা হয়নি। এইবার এক মাস হয়ে যাচ্ছে। এতদিন থাকতো না,যদি না পূর্ণার দেখা পেতো।

জ্যোৎস্না রাত নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা ছিল। কিন্তু ফরিনার মৃত্যুর জন্য সে রাত উপভোগ করা হয়নি। সে আগামীকাল বাড়ি ফিরবে। তাই পূর্ণার সাথে দেখা করতে এসেছে।

নূপুরধ্বনি ভেসে আসে! মানে পূর্ণা আসছে! মৃদুল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ণা দৃশ্যমান হয়। সে মৃদুলের সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদুল পূর্ণার দিকে এক কদম এগিয়ে এসে বললো,'কেমন আছো?'
'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'
'ভালা। প্রান্তর কী খবর?'
'কুড়াল বানাচ্ছে।'
'ওর কামই এমন।'
পূর্ণা হাসলো। মৃদুল বললো,'চলো নদীর দিকে হাঁটি।'
'চলুন।'
দুজন মাদিনী নদীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুই দিকে গাছপালা। দুজনের মাঝে দুই হাত দূরত্ব। মৃদুল এক টুকরো পাথর নদীর পানিতে ছুঁড়ে দিল। পাথরটি পানিতে দুই,তিন বার ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে ডুবে যায়। পূর্ণা হাসলো। বললো,'আমিও এরকম পারি।'
মৃদুল একটা পাথর পূর্ণার হাতে দিয়ে বললো,'কইরা দেখাও।'
পূর্ণা করে দেখালো। তারপর বললো,'চাপা মারি না আমি।'

মৃদুল শুধু হাসলো। কিছু বললো না। পূর্ণা অপেক্ষা করছে,মৃদুল কী বলবে শোনার জন্য। অনেকটা সময় কেটে যায়। মৃদুল পূর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দুই পা এগিয়ে আসে। পূর্ণা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছে। মৃদুল পূর্ণার দুই হাত শক্ত করে ধরলো। পূর্ণা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। মৃদুল তার হাত ধরলে সে অন্য এক জগতে চলে যায়। যে জগতে কেউ নেই। শুধু ভালোবাসা,ভালোবাসা আর ভালোবাসা। মৃদুল বললো,"রাইতে বাড়িত যাইতাছি।'
বাড়িতে যাবে শুনে পূর্ণার চোখেমুখে আঁধার নেমে আসে। সে প্রশ্ন করলো,'রাতে কেন?'
'রাতে হাওলাদার বাড়ির একটা ট্রলার ওদিকে যাইব। তাই রাইতেই যাব ভাবতাছি।'
পূর্ণা নতজানু হয়ে ব্যথিত স্বরে বললো,'ওহ,আচ্ছা যান।'
মৃদুল বললো,'মন খারাপ কইরো না। জলদি আইসা পড়ব।'
পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। মৃদুল চলে যাবে শুনলেই,তার বুক ফেটে কান্না আসে। সে মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,'কেন আপনি এতো দূরের মানুষ?'
তার ব্যাকুল কণ্ঠের অভিযোগটি মৃদুলের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে। সে মৃদু হাসলো। পূর্ণার হাত দুটি শক্ত করে ধরে বললো,'আম্মা-আব্বারে নিয়া আসব।'
পূর্ণা চকিতে তাকায়। ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তি আলাদা হয়ে যায়। মৃদুল পূর্ণাকে আরো অবাক করে দিতে বললো,'তোমার আপাই বলেছে,আমার আম্মা-আব্বাকে নিয়া আসতে।'
পূর্ণার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে বসে পড়লো। দুই হাতে মুখ ঢেকে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,'কী বলছেন এসব!'
মৃদুল পূর্ণার সামনে বসলো। পূর্ণাকে নিজেকে সামলে নিতে দিল। তারপর বললো,'যা হওয়ার ছিল,তাই হইতাছে।'
পূর্ণা ঠোঁটে হাসি,চোখে জল নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃদুলকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু এটা অসম্ভব। সে চোখ বুজতেই দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা বলা হয়নি,তবুও দুজন মনে মনে জানে তারা একজন, আরেকজনকে কতোটা ভালোবাসে। কতোটা চায়!

মৃদুল বললো,'সন্ধ্যা হইয়া যাইতাছে। এখন বাড়িত যাও। আমি সন্ধ্যার পরে খাওয়াদাওয়া কইরা রওনা দেব।'
পূর্ণা কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা সে কী শুনলো! সে ধীর কণ্ঠে বললো,"সাবধানে যাবেন,সাবধানে আসবেন।'

মৃদুল পূর্ণার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ালো। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তের আলোয় পূর্ণাকে তার অপ্সরী মনে হচ্ছে। চোখের ঘন পাঁপড়িগুলো চোখের জলে ভিজে আরো ঘন,কালো হয়ে উঠেছে। পূর্ণা মৃদুলের তাকানো দেখে লজ্জা পেল। বললো,'কালো মানুষকে এভাবে দেখার কী আছে?'
মৃদুল চমৎকার করে বললো,'তুমি যদি আমার চোখ দিয়া নিজেরে দেখতা বুঝতে পারতা তুমি ঠিক কতোটা সুন্দর!'
কথাটি পূর্ণার হৃদয় নাড়িয়ে দেয়।

_____
শুটিং চলছে আসহাব নামে একজন ব্যারিস্টারের বাড়ির পুকুরঘাটে। আসহাব চৌধুরী পরিচালক আনোয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসহাব ঢাকায় থাকেন। কয়দিন হলো গ্রামে এসেছেন। বাড়িটা বানিয়েছেন বাংলো বাড়ির মতো। আসহাব ও আনোয়ার ছাদে বসে গল্প করছেন। শুটিং শেষ হয় সন্ধ্যার খানিক পর। লিখন ক্লান্ত। সে জ্যাকেট পরে বারান্দায় এসে বসে। চারিদিকে গাছপালা। সুন্দর দৃশ্য। তার সহযোগী চা দিয়ে যায়। সে চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে,পদ্মজার কথা। সোমবারে তাদের দল ঢাকা ফিরবে। তার আগে দেখা হতো যদি! তৃধা লিখনের পাশে এসে বসলো। লিখন তৃধাকে খেয়াল করে বললো,'তৃধা!'
তৃধা তার মিষ্টি কণ্ঠে বললো,'অন্য কাউকে আশা করেছিলে?'
লিখন হেসে চায়ে চুমুক দিল। বললো,'আর কার আশা করব?'
'কেন? পদ্মজা।'
লিখন জোরে হেসে উঠলো। যেন তৃধা কোনো মজার কথা বলেছে। লিখন বললো,'তুমি অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলো তৃধা। পদ্মজা এখানে আসবে কোন দুঃখে?'
'আসতেও পারে।' তৃধার কণ্ঠে হিংসা। সে পদ্মজা নামের না দেখা মেয়েটাকে খুব হিংসা কিরে। সব মেয়েরা তাকে হিংসা করে,আর সে করে বিবাহিত এক মেয়েকে! যে মেয়ে তার স্বপ্নের পুরুষের বুকের পুরোটা জুড়ে থাকে। যদি সে পারতো,লিখনের বুক ছিঁড়ে পদ্মজার নামটা মুছে দিত।
লিখন নির্বিকার কণ্ঠে বললো,'ঘরে যাও তৃধা।'
'যাব না।'
'এভাবে চলতে থাকলে,আর কখনো তোমার সাথে কাজ করার সুযোগ হলেও করতে পারব না।'
তৃধার মুখটা লাল হয়ে যায়। রাগে,হিংসায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো,'আমিতো বলেছি,আমি তোমার বাসার কাজের মেয়ে হতেও রাজি।'

লিখনের মুখ ফসকে চা বেরিয়ে আসে। সে হাসতে থাকে। তৃধা প্রায় সময় এমন অদ্ভুত, অদ্ভুত কথা বলে। যা একটা সদ্য কিশোরী মেয়েকেই মানায়। তখন পরিচালক আনোয়ার হোসেন সেখানে উপস্থিত হয়। লিখনকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রশ্ন করলেন,' কী নিয়ে এতো হাসা হচ্ছে?'
তৃধা দ্রুত চোখের জল মুছলো। লিখন হাসি থামিয়ে বললো,'তেমন কিছু না। বসুন।'
'না,বসব না। শুনো লিখন,হাওলাদার বাড়ির মাতব্বরকে তো চিনো?'
'জি। দুইদিন আগে বাড়ির কর্তী মারা যায়। দেখতে গিয়েছিলাম।'
'হুম,শুনেছি। মাতব্বর মজিদ হাওলাদার প্রতি বছর বাড়ির ছেলে-বউদের নিয়ে শীতে গরীবদের শীতবস্ত্র দান করেন। বড় সমাবেশ হয়। বড় উদার মনের মানুষ। সমাবেশ শেষে কয়েকজনকে

নিয়ে ভোজন আসর জমান। মজিদ হাওলাদারের ভাই আসহাবের সাথে আমাকে দাওয়াত করে গেছেন। আমি আগামীকাল সেখানে থাকব। এদিকটা তোমাদের রেখে যাচ্ছি।'
লিখন আনোয়ারকে আশ্বাস দিয়ে বললো,'চিন্তা করবেন না। এখানে সবাই বুঝদার। কেউ বিশৃঙ্খলা করবে না।'
'সে আমি জানি। দাওয়াত পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। মজিদ হাওলাদারের অনেক সুনাম শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখতে পারবো। খুব ভালো লাগছে।'
'জি,তিনি খুব ভালো মনের মানুষ। আমি একবার ছিলাম উনার বাড়িতে। পরিবারের সবাই খুব ভালো।'
আনোয়ার হোসেন হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কিত আরো কিছু কথা বললেন। তারপর চলে যান। তৃধা লিখনকে প্রশ্ন করলো,'তাহলে পদ্মজাও আসবে?'
'হু,আসবে বোধহয়।'
তৃধার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পদ্মজা নাম উঠলেই তার খারাপ লাগে। তবুও সে এই নাম তোলে। সে অভিমানী স্বরে বললো,'তুমি যাবে?'
'ভাবছি যাব।'
'আমিও যাব। সেই ভাগ্যবতী মেয়েটাকে দেখতে চাই।'
লিখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললো,'ভাগ্যবতী মেয়ে না একটা ভাগ্যবান পুরুষকে দেখাব।' কথা শেষ করে লিখন সামনের দিকে পা বাড়ায়। তৃধা তখন বললো,' সে নিশ্চয়, আমির হাওলাদার। আপনার শুধু এই একটা মানুষকেই কেন ভাগ্যবান মনে হয়?' শেষটুকু রাগে কিড়মিড় করে বললো, তৃধা।
লিখন এগিয়ে যেতে যেতেই বললো,'তুমি এতসব কোথা থেকে যে জানো!'

_____

অন্দরমহলে মজিদ ছাড়া কোনো পুরুষ নেই। তাদের মেয়ে পাচারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সবাই শিকারে অথবা কোনো প্রয়োজনীয় কাজে গেছে বোধহয়। মৃদুল নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। মগা কোথায় পদ্মজা জানে না। মদন মারা গেছে। এই খবর শুনে পদ্মজা অবাক হয়েছিল। মদনের মাথায় আঘাত ছিল,ব্যান্ডেজ ছিল। এই অবস্থায় সেদিন পাতালঘরে যাওয়ার সময় পদ্মজা মদনের মুখ না দেখে মদনকে মাথার একই জায়গায় আঘাত করেছিল। ফলে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মারা যায়। পদ্মজার দুঃখ হয় আলোর জন্য। আলোর মা নেই,এখন বাবাও নেই। পদ্মজা এই মুহূর্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে। অন্দরমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। যারা পদ্মজাকে পাহারা দেয়। মজিদের উপর হামলা করার উপযুক্ত সময়! পাতালঘরের চাবিও নিতে হবে। পদ্মজা অনুসন্ধানী চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমির দুই হাতে মাথা চেপে ধরে উঠে বসে। মাথাটা ভন ভন করছে,রক্ত শুকিয়ে গেছে। সে দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে আসে। তাকে পাতালঘরে যেতে হবে। সে নিচ তলায় নামার জন্য সিঁড়িতে পা রাখে। মজিদের ঘরের পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে যায়। সে ছুরি হাতে ওৎ পেতে থাকে। আমিনা কখনো উপরে যায় না। লতিফা,রিনুকে সে নিজে নিচ তলার এক ঘরে ঘুমাতে দেখেছে। যে ব্যাক্তি নেমে আসছে,তার পায়ের শব্দ ধীর গতির। ধীর গতিতে একমাত্র খলিল সিঁড়ি ভেঙে নামে। পদ্মজার অনেক দিনের ইচ্ছে,খলিলকে জখম করার। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পায়ের শব্দটি কাছে আসতেই পদ্মজা ছুরি দিয়ে আন্দাজে আঘাত করে। আমির 'আহ' করে উঠলো। আক্রমণকারীরা

কখনো আমিরের থাবা থেকে বের হতে পারে না। আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে আমির পদ্মজাকে না দেখেই,পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আন্দাজে তার এক হাত দিয়ে পদ্মজার মুখ খামচে ধরে দেয়ালে বারি মারলো। তাৎক্ষণিক আমিরের নখ ডেবে যায় পদ্মজার দুই গালে! রাতের অন্ধকার একজন আরেকজনকে ভুলক্রমে আঘাত করার মাধ্যমে ইশারা দেয়,তারা দুজন দুই পথের পথিক!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৫

পদ্মজার মৃদু আর্তনাদ শুনে আমিরের রক্ত ছলকে উঠে। সে দ্রুত তার শার্টের বুক পকেট থেকে লাইটার বের করে,আগুন জ্বালাল। হলুদ আলোয় পদ্মজার মুখখানা ভেসে উঠে। মাথা দুই হাতে ধরে রেখেছে। ভ্রুযুগল কুঁচকানো। আমির অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো,'পদ্মজা!'
সে পদ্মজাকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ায়। তখন পদ্মজা বললো,'দূরে সরুন।'
পদ্মজার কণ্ঠে একটু তেজের আঁচ টের পাওয়া যায়। আমির কথা বাড়ালো না। সোজা লতিফার ঘরের দিকে গেল। লতিফা,রিনুকে ডেকে নিয়ে আসে। রিনুর হাতে হারিকেন। লতিফা,রিনু পদ্মজাকে উঠতে সাহায্য করে। পদ্মজার মাথা ফুলে গেছে। ভনভন করছে। পদ্মজা লতিফাকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করে। শেষ ধাপে গিয়ে একবার পিছনে ফিরে তাকাল। হারিকেনের হলুদ আলোয় আমিরের জীর্ণশীর্ণ মুখটা দেখে পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠে। কোথায় ছুড়ির আঘাত পেয়েছে কে জানে! পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। আমির রিনুকে বললো,'উপরে যা। লতিফা বুবুকে সাহায্য করিস।'
রিনু নতজানু হয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো,'তোমার ঘাড় দিয়া রক্ত আইতাছে ভাই।'
আমির হাসলো। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় পা ফসকে যায়। আমির কুঁজো হতেই পদ্মজার আক্রমণ! এক জায়গায় বার বার আঘাত পেতে হচ্ছে! আমির রিনুকে বললো,'ঘাড়টা পঁচে যাওয়া বাকি! যা,উপরে যা।'

আমির অন্দরমহলের বাইরে পা রেখে ঠান্ডা বাতাসে কেঁপে উঠে। শীতের প্রকোপ তীব্র! মাথায়,ঘাড়ে তীব্র ব্যাথা। ঠান্ডা বাতাসে আরো ভয়াবহ যন্ত্রনা হচ্ছে! সবকিছু ছাপিয়ে হৃদয়ের ব্যথাটা দ্বিগুণ আকারে বেড়ে চলেছে। পদ্মজার ঘৃণাভরা দৃষ্টি আমির আর নিতে পারছে না। প্রথম দিকের মতো শান্ত থাকা যাচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে পঙ্গু হওয়ার পথে। শরীরের রক্ত আর হৃদয়ের যুদ্ধ আমিরের শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।
নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আমির নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে। দুই হাতে চুল ঠিক করে অন্দরমহলের পিছন দিকে হেঁটে আসে। তিন-চারটে কুকুর দেখতে পেল। ভাঙা প্রাচীর দিয়ে হয়তো প্রবেশ করেছে। আমির কুকুরগুলোর দিকে এক ধ্যাণে তাকিয়ে থাকে। কুকুরগুলোও তাদের হিংস্র চোখ দিয়ে আমিরকে দেখছে। আমির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।
রাতের নিস্তব্ধতায় সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ দুরন্ত বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেকদূর পর্যন্ত। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো সেই শব্দ শুনে চমকে উঠল।

নড়েচড়ে দূরে সরে গেল। আমির হেসে তাদের বললো,' বুকের যন্ত্রনার এক অংশও দীর্ঘশ্বাসের সাথে বের হয়নি! আর এতেই ভয় পেয়ে গেলি তোরা?'
একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। আমির এগিয়ে যেতেই কুকুরগুলো ছুটে পালায়। আমির অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। অকারণেই হাসলো। তারপর গভীর জঙ্গল পেরিয়ে পাতালঘরে প্রবেশ করে। রাফেদ আমিরকে দেখে আঁতকে উঠলো। বললো,'স্যার,কীভাবে হলো এসব?'
আমির চেয়ার টেনে বসে বললো,'দ্রুত পরিষ্কার করো।'

রাফেদ আমিরকে পরিষ্কার করে দিলো। আমির শার্ট পাল্টে পাঞ্জাবি পরলো। তার আর কোনো কাপড় এখানে নেই। সব অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল। সাদা পাঞ্জাবি রয়ে গেছে। পাঞ্জাবিটা পরতে গিয়ে মনে পড়ে পদ্মজার কথা। পদ্মজার সাদা রঙ পছন্দ। প্রতি শুক্রবারে আমির সাদা পাঞ্জাবি পরে জুম্মায় যেতো। জুম্মায় যাওয়ার পূর্বে পদ্মজা খুব যত্ন করে পাঞ্জাবির তিনটে বোতাম লাগিয়ে দিতো। লাগানো শেষে বলতো,' আমার সুদর্শন স্বামী।'
পদ্মজা যতবার এ কথা বলতো,ততবার আমির প্রাণখুলে হেসেছে। সে জানে না পদ্মজার চোখে সে কতোটা সুন্দর! কিন্তু পদ্মজার দৃষ্টি ছিল মুগ্ধকর! মুগ্ধ হয়ে সে আমিরকে দেখতো। আমির পাঞ্জাবির বোতামে চুমু দেয়। তখনই কানে বেজে উঠে, "ছুঁবেন না আমায়!,দূরে সরুন!,আমি আপনাকে ঘৃণা করি!'

কথাগুলো তীরের মতো আঘাত হানে মস্তিষ্কে! আমির নিজের চুল খামচে ধরে। রাগে চিৎকার করতে করতে এওয়ানের পালঙ্কে লাথি দিতে থাকে। পালঙ্ক ভেঙে যায়। রাফেদ দৌড়ে আসে। কিন্তু আমিরকে ধরার সাহস হয় না। আমিরকে আর যে যাই ভাবুক! রাফেদ জানে,আমির পাগল। একটা সাইকো সে। যখন রেগে যায় সবকিছু তছনছ করে ফেলে। আমিরের এই রাগের স্বীকার যে মেয়ে হয়েছে,সে মেয়ে নিঃশ্বাসে,নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে।
রাফেদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে মনে মনে,এই হিংস্র মানুষটার মৃত্যু কামনা করে। কত মেয়ে আমিরকে বাবা,ভাই ডেকেছে ছেড়ে দেয়ার জন্য। আমির ছাড়েনি। মুখের উপর লাথি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেতে। রাফেদ বাধ্য হয়ে এই জগতে প্রবেশ করেছে। অর্থের অভাবে!
ভাবেনি,এতোটা পাশবিক, নির্মম এরা! কিন্তু আর বের হওয়ার উপায় ছিল না। বের হতে চাইলেই,মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে এই নৃশংসতার সাথে তাল মিলিয়েছে। পরিবারের দুর্দশা তাকে জ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। এক কথায় গ্রহণ করে নিয়েছিল এই পথ! যখন একেকটা মেয়ের কান্না সে শুনে, মনে হয় তার বোন কাঁদছে,আকুতি করছে! প্রথম প্রথম সেও কান্না করতো। এখন মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মনের কোণে মুক্তির আশা এখনো আছে। তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও ধারালো কাছের মানুষের দেয়া আঘাত! যেদিন রাফেদ বুঝতে পেরেছে আমিরের দূর্বলতা পদ্মজা,সেদিন থেকে সে দোয়া করছে, আমির যেন এই দূর্বলতার ভার সহ্য করতে না পেরে দূর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটুগেড়ে পড়ে যায় মাটিতে। নিঃস্ব হয়ে যেন দিকদিশা হারিয়ে ফেলে। আমিরের ছটফটানি, অস্থিরতা রাফেদের মনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। আমির শান্ত হয়! রাফেদকে বললো,'পানি আনো।'

রাফেদ পানি নিয়ে আসে। আমির পানি পান করে ধ রক্তে এসে প্রবেশ করে। বিথ্রিতে আমির পা রাখতেই মেয়েগুলোর চোখেমুখে স্পষ্ট ভয় জমে। রাফেদ চেয়ার নিয়ে আসে। আমির চেয়ারে বসলো না। মেয়েগুলোকে দেখে বেরিয়ে আসলো। বিওয়ানে গেল। সেখানে একটা মেয়েও নেই! শুকনো রক্ত পড়ে আছে। সবকয়টি মেয়ে কুরবান হয়ে গেছে। নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। এই

ঘরের দেয়ালে দেয়ালে শত শত মেয়ের আর্তনাদ বাজে। আমির পুরো ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলো। বিশ বছর আগে সে এই পাতালঘরে প্রথমবার এসেছিল। তখন তার বয়স পনেরো। তার বয়সী একটা মেয়েকে সে প্রথম আঘাত করেছিল এই ঘরেই! মেয়েটা আমিরের পায়ে ধরে মুক্তি ভিক্ষা চায়। আমির মুখের উপর লাথি মারে। সঙ্গে,সঙ্গে মেয়েটার নাক,মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মনে পড়তেই আমিরের শরীরটা কেমন করে উঠে। তার ভেতরে অদৃশ্য কী যেন প্রবেশ করছে! ভেতরটা খুঁড়ে, খুঁড়ে খেয়ে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। এক কোণে সুন্দর নকশায় তৈরি করা,সিংহাসনের মতো চেয়ার রয়েছে। আমির সেখানে বসলো। এই চেয়ারে বসে কত নগ্ন মেয়ের, তীব্র যন্ত্রনার আর্তনাদ সে উপভোগ করেছে! আমির এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে। চোখের পর্দায় পদ্মজার রাজত্ব! তাদের ঢাকার বাড়িতে কোনো এক বর্ষায়,পদ্মজা তার শাড়ি দুই হাতে গোড়ালির উপর তুলে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পিছনে ধাওয়া করেছে,আমির। পদ্মজার কলকল হাসিতে যেন পুরো বাড়ি নৃত্য করছিল। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি! কী অপূর্ব সেই মুহূর্ত। আমির চোখ খুলে ছাদের দিকে তাকায়। তারপর রাফেদকে ডাকলো,'রাফেদ?'
রাফেদ দৌড়ে আসে। আমির রাফেদকে মিনিট তিনেক সময় নিয়ে দেখলো। তার চোখের দৃষ্টি শীতল। রাফেদের বুক দুরুদুরু করছে। আমির বললো,'কেমন আছো?'
রাফেদ চমকে যায়। সে হতভম্ব। বেশ খানিক সময় নিয়ে উত্তর দিল,' ভালো স্যার।'
'তোমার বোনের ছেলে হয়েছিল নাকি মেয়ে?'
রাফেদের মনে হচ্ছে,তার কলিজা এখুনি ফেটে যাবে। তার চোখ দুটি মারবেলের মতো গোল,গোল হয়ে যায়। সে কণ্ঠে বিস্ময়তা নিয়ে বললো,'ছেলে-মেয়ে দুটোই।'
'জমজ?'
'জি,স্যার।'
'তুমি মুক্তি চাও?'
রাফেদ বিস্ময়ের চরম পর্যায়ে। আমির বললো,' যদি চাও,তাহলে আজ থেকে তুমি মুক্ত।'
রাফেদের মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ে। সে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লো। অস্থির হয়ে পড়ে। তার অনুভূতি এলোমেলো হয়ে যায়। সে আমিরের দুই পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল। বললো,'স্যার,স্যার আমি মারা যাচ্ছি।'
আমির আদেশের স্বরে বললো,'পা ছাড়ো রাফেদ। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে জায়গা না ছাড়লে,আর যেতে পারবে না।'
রাফেদ ঝরঝর করে কাঁদতে থাকল। যেন পাহাড় ভেঙে ঝর্ণার পানি ঝরছে। আমির বললো,'উঠো তারপর দৌড়াও।'
রাফেদ দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। সে তার ব্যাগ গুছিয়ে দ্রুত এই অন্ধকার ছেড়ে হারিয়ে যায়, আলোর সন্ধানে। আমিরের বুকটা খাঁখাঁ করছে। রাফেদের চোখেমুখে মুক্তির যেই আনন্দ সে দেখেছে,সেই আনন্দের তৃষ্ণায় তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে। কবে এই তৃষ্ণা মিটবে? কবে?
আমিরের বুকে জ্বালাপোড়া শুরু হয়,মনে হচ্ছে কোনো ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। যে ঘূর্ণিঝড় চোখের পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে,স্তব্ধ করে দিবে।

_____
লতিফা,রিনু চলে যেতেই পদ্মজা বিছানা ছেড়ে টেবিলে বসলো। হাতে তুলে নিলো কলম-

প্রিয়তম,
আমার প্রতিটি রজনী যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমি আপনাকে ভুলে যেতে চাই। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না! বিছানার চাদরে আপনার শরীরের ঘ্রাণ। শরীরের প্রতিটি লোমকূপ বার বার জানান

দেয়,তারা আপনাকে ভালোবাসে। আমার অস্তিত্বের পুরোটা জুড়ে আপনার বিচরণ। বুকের ভেতরটা দগ্ধ হয়ে খানখান। আপনার উন্মুক্ত বুকের সাথে চেপে ধরে বলেছিলেন, আপনার তেঁতো জীবনের মিষ্টি আমি। আপনার মুখে ছিল
হাজার,হাজার শুকরিয়া।অথচ,এই সময়ে এসে আপনি আপনার তেঁতো জীবনটা বেছে নিয়েছেন। ছুঁড়ে ফেলেছেন আমাকে! এ কোন গভীর সমুদ্রের অতলে আমাকে ছুঁড়ে দিলেন? আপনার পাপের শাস্তি কেন আমি পাচ্ছি? আবেগ-বিবেকের যুদ্ধে আমি বার বার আহত হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি। নিজের সবটুকু আপনার নামে দলিল করে দিয়ে,আমি ভুল করেছি। এখনো আপনার শরীরের একেকটা আঘাত আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কিন্তু আমি আপনাকে আঘাত করতে চাই। আমার ভেতরের জ্বলন্ত আগুন নেভাতে, আপনার এবং আপনার দলের প্রতিটি নরপশুর রক্তের ভীষণ প্রয়োজন!

এতটুকু লিখে পদ্মজা থামলো। তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। আর লেখার শক্তি পাচ্ছে না। ডায়রির পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে, দিয়াশলাইয়ের আগুনে জ্বালিয়ে দিলো। আলমারি খুলে আমিরের দেয়া তলোয়ারটি হাতে নিল। তলোয়ারের দিকে দৃষ্টি রেখে বললো,'আপনার বুকের হৃদয়ে আমি আজীবন রানি হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। সেই বুকে আমি কী করে আঘাত করব?'

শেষ কথাটি বলার সময় পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে নোনাজল নামে। সে তলোয়ার মেঝেতে রেখে,বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকলো। আমির যে পাশে সবসময় শুতো,সে জায়গাটা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! কোথায় মানুষটার উষ্ণ বুক? যে বুকে মুখ গুঁজে পদ্মজা তার সব কষ্ট ভুলে যেত!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৬
_____
রবিবার। তীব্র শীতের সকাল। সময় তখন আটটা। বাড়িজুড়ে সবার ছোটাছুটি। পদ্মজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করছে। সে পাতালঘরের চাবি খুঁজছে। হাতে সময় নেই। আজ রাতের মধ্যে জীবন বাজি রেখে হলেও কিছু করতে হবে। আলগ ঘরের সামনে খলিল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথায় উলের টুপি। লম্বা গোঁফ। মগাকে ধমকে কাজ বুঝাচ্ছেন। চারিদিকে উৎসব উৎসব আমেজ! দুপুরের নামাযের পর স্কুলের মাঠে সমাবেশ। আলগ ঘরে এবং বাইরে শত-শত কম্বল আর শীতবস্ত্র। হাওলাদাররা হারাম টাকায় লোক দেখানো নাটক করতে চলেছে! পদ্মজা মনে মনে ব্যঙ্গ করে হাসলো। রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বের হয়ে খলিলের পাশে এসে দাঁড়াল। তার পরনে কালো রঙের পাঞ্জাবি। গায়ের রঙ ফর্সা। তাই কালো রঙের পাঞ্জাবিতে সুদর্শন দেখাচ্ছে। পদ্মজা লতিফার কাছে শুনেছে,কয়দিনের মধ্যে নাকি রিদওয়ানের বিয়ে! কার সাথে বিয়ে কেউ জানে না। তবে এটা নিশ্চিত, কোনো অভাগীর জীবন দুর্বিষহ হতে চলেছে! রিদওয়ান, খলিল কী বিষয়ে কথা বলছে তা পদ্মজার কানে আসার কথা নয়। তবুও সে সেদিকে তাকিয়ে

আছে। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হয় আমির। আমির এদিক-ওদিক দেখে খলিলকে বললো,'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে আগামীকাল ভোর হয়ে যাবে। আবারো বলে যাচ্ছি, পদ্মজার গায়ে হাত তো দূরে থাক,কারো চোখও যেন না পড়ে।'
রিদওয়ান নির্বিকার কণ্ঠে বললো,'তোর দুই চামচারে বলে যা,পদ্মজার উপর ভালো করে খেয়াল রাখতে। পাতালে তো কোনো মেয়ে নাই। তাই চিন্তাও নাই। তবে,কাউকে যেন কিছু না বলে। আর আমাদের উপর তেড়ে না আসে।'
'তেড়ে আসলেও কিছু বলবি না। সুন্দর করে সামলাবি।'
রিদওয়ান তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললো,'ধুর! এই মাইয়ারে কতদিন এভাবে রাখবি? হুদাই ভেজাল।'
আমির রেগে রিদওয়ানের দিকে এক পা বাড়ালো। খলিল পরিস্থিতি পাল্টাতে দ্রুত রিদওয়ানের বুকে ধাক্কা দিয়ে বললো,'যা কইতাছে হুন। বাবু তুই যা,তোর বউরে কেউ কিচ্ছু করব না।'

আমির রিদওয়ানের চোখের দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে রিদওয়ানকে সাবধান করে দিল। তারপর জায়গা ছাড়ল। অন্দরমহলে ঢোকার পূর্বে চোখ পড়ে দ্বিতীয় তলার বারান্দায়। পাংশুটে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভেতরের অনুভূতিগুলো পাল্টে যায়। সে দৃষ্টি সরিয়ে দ্রুত অন্দরমহলে প্রবেশ করলো। পদ্মজা ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমির ঘরে এসে শার্ট,জ্যাকেট খুলে গোসলখানায় ঢুকে। তাকে ঢাকা যেতে হবে। হাতে সময় আছে, তবুও সে আজই মেয়েগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে। সে নিশ্চিত, পদ্মজা চেষ্টা করবে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে। আবার মুখোমুখি হতে হবে দুজনকে। একত্রিশটা মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে যখন আর রাখার মানে নেই। সে ঝুঁকি নিতে চায় না। পদ্মজা কী মনে করে দ্রুতপায়ে ঘরে আসলো। বিছানায় আমিরের শার্ট দেখে বুঝতে পারে আমির গোসলখানায় আছে। তাৎক্ষণিক পদ্মজা ভাবলো,আমিরের শার্টের পকেটে তল্লাশি চালাবে। যদি চাবি পাওয়া যায়! যেমন ভাবা তেমন কাজ।

চাবির কথা মনে পড়তেই আমির গোসলখানার দরজা খুললো। পদ্মজা শার্টের পকেটে একটা চাবি খুঁজে পায়। তার মুখে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। পুরোটা দৃশ্য আমিরের চোখে পড়ে। সে দরজা বন্ধ করে দেয়। পদ্মজার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। এই চাবি আর পদ্মজার কাজে লাগবে না! সে পাতালঘরে গিয়ে কিছু খুঁজে পাবে না। আমির নিশ্চিন্তে গোসল শেষ করলো। পদ্মজা চাবি নিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে। সেখানে লতিফা, রিনু,আমিনা সহ আরো তিন-চারজন রান্না করছে। সমাবেশ শেষে আলগ ঘরে ভোজ আয়োজন হবে,তারই প্রস্তুতি চলছে। খলিল হাওলাদারের দুই মেয়ে শাহানা,শিরিনও আজ আসবে। পদ্মজা কাজ করার বাহানায় লতিফার কাছে গিয়ে বসলো। লতিফা পদ্মজাকে দেখে হাসলো তারপর কাজে মন দিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পদ্মজা সুযোগ বুঝে লতিফাকে ফিসফিসিয়ে বললো,'উনি বেরিয়ে গেলে আমাকে বের হতে সাহায্য করো বুবু।'
লতিফা চোখ বড় বড় করে তাকায়। চাপাস্বরে প্রশ্ন করে,'কই যাইবা?'
পদ্মজা পিছনে ফিরে তাকায়। আমিনা থালাবাসন পরিষ্কার করছেন। পদ্মজা আমিনার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর লতিফাকে বললো,' পাতালে যাবো।'
লতিফার হাত থেকে চামচ পড়ে যায়। ঝনঝন শব্দ হয়। শব্দ শুনে উপস্থিত সবাই উৎসুক হয়ে তাকায়। লতিফা দ্রুত চামচ তুলে নিলো। সবার দিকে চেয়ে হাসি বিনিময় করে পদ্মজাকে চাপাস্বরে বললো,' চাবি কই পাইবা?'
পদ্মজা বললো,'পেয়ে গেছি। তুমি শুধু সুযোগ করে দাও।'

লতিফার চোখেমুখে ভয় বাসা বাঁধে,যা স্পষ্ট। সে ভয় পাচ্ছে,আমির জেনে গেলে তার জীবন শেষ!
পদ্মজা সবাইকে আরো একবার এক নজর দেখে নিয়ে লতিফাকে বললো,'ভালো কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সম্মানের বুবু।'
লতিফা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো। সে রাজি। পদ্মজা তার ঘরে ফিরে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় আমির নিচে নামছিল। দুজন কেউ কারোর দিকে তাকায়নি। যেন কেউ কাউকে চিনে না। পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর হাতে তুলে নিল ছুরি।

লতিফা আলগ ঘরে গিয়ে খোঁজ নেয়। আমির,মজিদ,রিদওয়ান কেউ বাড়িতে নেই। খলিল আলগ ঘরের বারান্দায় তিন জন লোকের সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছে।লতিফা দ্রুত এসে পদ্মজাকে পরিস্থিতি জানায়। পরিস্থিতি গুছানো। এবার পদ্মজার পিছনে আঠার মতো লেগে থাকা দুজন লোককে সরানোর পালা। পদ্মজা আবার রান্নাঘরে আসে। দুজন লোক সদর ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের উপস্থিতি দেখে কেউ ভাববে না, এরা কাউকে নজরে রাখার জন্য পিছু,পিছু ঘুরে!
পদ্মজা লতিফাকে ইশারা করতেই,লতিফা দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বললো,'আপনেরা খাইবেন না?'
তারা সত্যি অনেক ক্ষুধার্ত। আবার রান্নাঘর থেকে মাংসের ঘ্রাণ আসছে। সেই ঘ্রাণে ক্ষিধে যেন বেড়ে যাচ্ছে। দুজন সম্মতি জানায়,তারা খাবে। লতিফা চোখের ইশারায় পদ্মজাকে বেরিয়ে যেতে বলে। তারপর দুজন লোককে খেতে দিল। দুজন ক্ষুধার্ত পাহারাদার কব্জি ডুবিয়ে খেতে থাকে। পদ্মজা তাদের অগোচরে বেরিয়ে পড়ে। বাইরের চারপাশ দেখে দ্রুত জঙ্গলে ছুটে আসে। জঙ্গলের পথ তার চেনা। তাই পাতালঘরের কাছে আসতে বেশি সময় লাগেনি। আল্লাহর নাম নিয়ে সে পাতালে প্রবেশ করে। তার হাতের চাবি প্রবেশদ্বার খুলতে সক্ষম হয়।

পদ্মজা এক হাতে শক্ত করে ধরে ছুরি। ধ-রক্ত ও স্বাগতম দরজার মাঝ বরাবর এসে সে থমকে যায়। কেউ নেই! সবকিছু চুপচাপ,নির্জন। সে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশের দেয়ালে চাবুক ছিল। তাও নেই! পদ্মজা থম মেরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েগুলো আছে তো? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই, পদ্মজার বুকে ধড়াস করে কিছু যেন পড়ে। সে দৌড়ে ধ-রক্তে প্রবেশ করলো। উন্মাদের মতো প্রতিটি ঘর দেখলো। কেউ নেই! তার শরীর বেয়ে ঘাম ছুটে। ধ-রক্তের কোথাও কোনো চাবুক,ছুরি,রাম দা,কুড়াল কিছু নেই! এখানে যে অনাচার-ব্যভিচার হতো তার কোনো প্রমাণই নেই। পদ্মজা স্বাগতম দরজা পেরিয়ে সবকটি ঘরে তন্নতন্ন করে অসহায় মেয়েগুলোকে খুঁজে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। যখন নিশ্চিত হলো,এখানে কেউ নেই,তার হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। আমির তার চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিটি মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে। সে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে পারেনি। আফসোস আর আত্মগ্লানি তাকে চেপে ধরে। মেয়েগুলোর ছটফটানি,বাঁচার অনুরোধ কানে বাজতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে পদ্মজা। তার মনে হচ্ছে,তার মাথায় অনেক ভারি একটা বোঝা। নিজের প্রতি খুব রাগ হয়। সে কাঁদতে থাকলো। শাড়ি খামচে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো,'আমি পারিনি! আমি এই ব্যর্থতা কোথায় লুকাবো আল্লাহ!'
পদ্মজার কান্না দেয়ালে দেয়ালে বারি খেয়ে পুরো পাতালপুরীতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সমাবেশে বাড়ির মেয়ে-বউদের যাওয়া আবশ্যক। এটা হাওলাদার বংশের আরেক রীতি। পরিবারের সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবে। শাহানা,শিরিন তৈরি। তারা নিচ তলায় অপেক্ষা

করছে। পদ্মজা তার ঘরে স্তব্ধ হয়ে পালঙ্কে বসে আছে। লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। বললো,'ও পদ্ম,বোরকা পিন্দো নাই ক্যান? জলদি করো।'
পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। তার চোখের চারপাশ লাল। চোখে ফোলা ফোলা ভাব। সে আত্মগ্লানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে, সে চাইলে পারতো মেয়েগুলোকে বাঁচাতে। সুযোগ ছিল। সত্যিকার অর্থে, তার সুযোগ ছিল না। পেছনের প্রতিটি নিঃশ্বাস সাক্ষী,সে প্রতি মুহূর্তে মেয়েগুলোর কথা ভেবেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। হন্ন হয়ে চাবি খুঁজেছে। ভেবেছিল,আরো দুই-তিন হাতে আছে। আমির এতো দ্রুত একত্রিশটা মেয়ে অপহরণ করে ঢাকা নিয়ে চলে যাবে সে ভাবেনি! ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। ভাবলেও কাজ হতো না! কিন্তু এসব কিছুই পদ্মজার মাথায় আসছে না। সে সমানতালে নিজেকে দোষী ভেবে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রনায় হারিয়ে যাচ্ছে অন্য জগতে। রিদওয়ান ঘরে এসে উঁচু গলায় বললো,'কি হলো? পদ্মজা এখনো তৈরি হয়নি কেন? আমাদের তো বের হতে হবে।'
পদ্মজার আচমকা মনে হলো,আমির মেয়েগুলোকে আজ রাতটা গোডাউনে অথবা অফিসে রাখতে পারে। আর নয়তো বাসায়। এর মধ্যে যদি কিছু করা যায়! কিন্তু কার সাহায্য নিবে সে? এখানে ঢাকার কে আছে? সেকেন্ড তিনেক ভাবার পর তার মাথায় লিখনের নাম আসে। লিখন চাইলে আমিরকে থামাতে পারবে। অবশ্যই পারবে! এতে আমিরের সম্পর্কে সব জেনে যাবে লিখন। বলি হবে আমির! এটা ভাবতে পদ্মজার কষ্ট হয়। সে ঢোক গিলে নিজের আবেগ,অনুভূতি সামলায়। সে আমিরকে মনে মনে বলি দিল। এখন লিখনই একমাত্র আশা। শুনেছে,শুটিং এখনো চলছে। পদ্মজা সিদ্ধান্ত নেয়,সে যেভাবেই হউক লিখনের সাথে আজ যোগাযোগ করবে। রিদওনের দিকে আগুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পদ্মজা বললো,'আসছি।'
রিদওয়ান তাড়া দিয়ে বললো,'জলদি।'
তারপর বেরিয়ে গেল। রিদওয়ান বের হতেই পদ্মজা বিড়বিড় করলো,'বেজন্মা!'
তারপর দ্রুত বোরকা,নিকাব পরে নিল।

_____
মৃদুল তার মা-বাবাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়িতে পা রাখে। তার বুকের গোপন কুঠুরিতে থাকা হৃদয়টা খুশিতে নৃত্য করছে। যখন সে তার মা বাবাকে বললো,সে বিয়ে করতে চায়। আর মেয়েও পছন্দ করেছে। তখনি তার মা-বাবা দুজনই খুশিতে আটখানা হয়ে যায়। মিয়া বাড়ির সবাই খুশিতে ভোজ আয়োজন করে। তাদের আদরের দুলাল মৃদুল। মৃদুল এতদিন অলন্দপুরে ছিল বলে,তার মা জুলেখা বানু অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছয় বিঘা ভূমির উপর কাঠের বাড়ি আর নব্বই বিঘা জমির একমাত্র উত্তরাধিকারী মৃদুল! তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির প্রতিটি মানুষ মৃতের মতো হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়,মৃদুলের বিয়ের সিদ্ধান্ত তাদের মাঝে ঈদের আনন্দ নিয়ে এসেছে। তাই এতো দ্রুত তাদের আগমন। মৃদুলের বাবা গফুর মিয়ার মাথায় টুপি,গায়ে দামী পাঞ্জাবি। শরীর থেকে আতরের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। জুলেখা নিকাব তুলে মৃদুলকে বললেন,' বাড়িত কী কেউ নাই?'
মৃদুল জুলেখাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললো,'অন্দরমহলে গেলেই মানুষ পাইবেন। একটু ধৈর্য্য ধরেন আম্মা।'
জুলেখা বানু কপাল কুঁচকালেন। তিনি স্বাস্থ্যবান একজন মহিলা। বাচাল প্রকৃতির মানুষ। রূপ এবং সম্পদ নিয়ে অহংকারের শেষ নেই। তিনি সরু চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে অন্দরমহলে আসেন। অন্দরমহলের সামনে রিনু ছিল। রিনু মৃদুলকে দেখে দাঁত বের করে হাসলো। এগিয়ে এসে বললো,'মৃদুল ভাইজান আইয়া পড়ছেন?'
'হ আইছি,দেখা যাইতাছে না?'

Kobitor.com

রিনু বোকার মতো হাসে। জুলেখা বানু আর গফুর মিয়ার পা ছুঁয়ে সালাম করে। মৃদুল বললো,'ফুফিআম্মা ঘরে আছে?'
'না ভাইজান। বাড়ির সবাই স্কুলঘরে গেছে।'
মৃদুলের পূর্বে জুলেখা প্রশ্ন করলেন,'কেরে? ওইহানে কী দরহার(দরকার)?'
রিনু বিস্তারিত বললো। গফুর মিয়া সন্তুষ্টির সাথে বললেন,'মনডা জুরায়া গেলো। হাওলাদার বাড়ির আত্মীয় যে হইবো হেরই সাত জন্মের কপাল।'
গফুরের প্রশংসা জুলেখা বানুর ভালো লাগেনি। অন্যের প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারেন না। হাতের ব্যাগটা রিনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বললেন,'এই ছেড়ি,ধরো ব্যাগডা।'
রিনু হাত বাড়িয়ে ব্যাগ নিল। জুলেখা বানু বললেন,'আমরা কোন ঘরে থাকমু? লইয়া যাও।'
'আপনেরা আলগ ঘরে থাকবেন।' বললো রিনু।
জুলেখা পিছনে ফিরে আলগ ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন,'এই টিনের ঘরডাত?'
জুলেখার প্রশ্নে অবজ্ঞা। তিনি টিনের ঘরে থাকতে আগ্রহী নয় বুঝাই যাচ্ছে। রিনু কিছু বললো না। মৃদুল জুলেখাকে আদুরে স্বরে বললো,'আম্মা,কম কথা কন। আমরা মেহমান।'

রিনু জুলেখার কথাবার্তায় বুঝে গেছে,এই মহিলা কোন প্রকৃতির। সে মনে মনে ভাবে,পূর্ণার কপালে ঝাটা আছে! জুলেখা আলগ ঘরে থাকবে না,এটা নিশ্চিত। রিনু জুলেখাকে অন্দরমহলে নিয়ে আসে। রানি-লাবণ্যর খালি ঘরটা দেখিয়ে বললো,'এই ঘরে থাকবেন।'
জুলেখা ব্যাগপত্র রেখে বিছানায় টান,টান হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছে। একবার ভাবলেন,রিনুকে বলবেন পা টিপে দিতে। কী মনে করে যেন বললেন না। মৃদুল গফুর মিয়াকে বললো,'আব্বা,আমি গোসল কইরা,খাওয়াদাওয়া কইরা স্কুলঘরে যাইতাছি। আপনি যাইবেন?'
'হ যামু। মহৎ কাজ নিজের চোক্ষে দেখাও ভাগ্যরে বাপ।'
মৃদুল জুলেখার উদ্দেশ্যে বললো,'আম্মা,আপনি যাইবেন?'
জুলেখা ক্লান্ত। তিনি মিনমিনিয়ে বললেন,'না আব্বা,আমি যামু না।'
মৃদুল ব্যাগ থেকে লুঙ্গি,গামছা বের করলো। জুলেখা উঠে বসেন। রিনুকে ডেকে বললেন,'এই ছেড়ি,কলডা কোনদিকে? আমারে দেহায়া দেও।'
জুলেখা আদেশ করলো নাকি হুমকি দিলো রিনু বুঝতে পারছে না। সে চুপচাপ জুলেখাকে নিয়ে কলপাড়ে গেল। লতিফা থাকলে ভালো হতো। নতুন কোনো মেহমান এসে তেড়িবেড়ি করলে লতিফা শায়েস্তা করতে পারে!

মাথার উপর সূর্য। মাঠভর্তি মানুষ। একপাশে মহিলা ও বাচ্চারা,অন্যপাশে পুরুষরা। শৃঙ্খলা বজায় রাখছে রিদওয়ান। উপর থেকে দেখলে,রিদওয়ান একজন মহৎ, ভদ্র,শান্ত ব্যাক্তি। যাকে সবমসময় দেখা যায় না। সবাই জানে,রিদওয়ান জ্ঞানী মানুষ। সারাক্ষণ বইপত্র নিয়ে থাকে। তাই তার দেখা পাওয়া যায় না। ভেতরে খবর যদি নিষ্পাপ মনের মানুষগুলো জানতো! হায় আফসোস! উপস্থিত প্রতিটি মানুষ খুব খুশি। এত এত মানুষকে শীতবস্ত্র দেয়া কম কথা নয়! সে কাজটা যখন হাওলাদার বাড়ির মানুষেরা করে,সবার কাছে তখন তারা ফেরেশতা হয়ে উঠে। ফেরেশতার সাথে তুলনা করা হয়। মজিদ হাওলাদার ও খলিল হাওলাদার শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন। পদ্মজা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার সাথে আঠার মতো লেগে আছে দুটি লোক। দুজন দুই দিকে দাঁড়ানো। তাদের চোখ সর্বক্ষণ পদ্মজার উপর। পদ্মজার চোখ দুটি লিখনকে খুঁজছে। লিখন এখানে আসবে নাকি সে জানে না। তবে প্রার্থনা করছে,সে যেন আসে। আজ তার উপস্থিতি

অনেকগুলো মেয়েকে বাঁচাতে পারে। লিখন নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ। সবকিছু শোনার পর সে কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই নিবে।

লিখন ভীড় ঠেলে প্রান্তর পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রান্ত লিখনকে দেখে অবাক হলো। তারপর হেসে করমর্দন করলো। বললো,'কেমন আছেন ভাইয়া?'
'ভালো,তুমি কেমন আছো?'
'ভালো ভাইয়া।'
'পূর্ণা,প্রেমা আসেনি?'
'আসছে। ওদিকে আছে।' প্রান্ত স্কুলের ডানদিকে ইশারা করে বললো।
তৃধা লিখনকে প্রশ্ন করলো,'কে ও? '
লিখন চাপাস্বরে বললো,'পদ্মজার ভাই।'
তৃধা তাৎক্ষণিক প্রান্তকে প্রশ্ন করলো,'তোমার পদ্মজা আপা কোথায়?'
প্রান্ত সোজা আঙুল তাক করে বললো,' ওইযে।'
তৃধা চোখ ছোট,ছোট করে সেদিকে তাকায়। প্রান্তকে আবার প্রশ্ন করে,'সবার তো মুখ ঢাকা। পদ্মজা কে?'
প্রান্তের আগে লিখন বললো,'লম্বা মেয়েটা।'
তৃধা আড়চোখে লিখনের দিকে তাকালো। বললো,'মুখ না দেখে চিনলে কী করে?'
'জানি না, মনে হলো। প্রান্ত ঠিক বলেছি?'
প্রান্ত হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। তৃধার খুব মন খারাপ হয়। প্রান্ত বললো,'ভাইয়া,আপা আপনাকে খুঁজছিল।'
'কোন আপা?'
'পদ্মজা আপা।'
মুহূর্তে লিখনের কী হয়ে যায়,সে নিজেও জানে না। তার বুকে অপ্রতিরোধ্য তুফান শুরু হয়! পদ্মজা তাকে খুঁজছে! এ যে অসম্ভব! লিখন চকিতে পদ্মজার দিকে তাকালো। পদ্মজার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাত-পা ঢাকা। তবুও মনে হচ্ছে,সে পদ্মজাকে দেখতে পাচ্ছে। ছয় বছর পূর্বে পদ্মজাকে যে রূপে প্রথম দেখেছিল। সে দৃশ্য ভেসে উঠে। তাদের প্রথম কথা! টমেটো আছে নাকি জিজ্ঞাসা করা! কত সুন্দর সেই মুহূর্ত।
লিখন পদ্মজার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। লিখনের চোখেমুখে আনন্দ স্পষ্ট! পদ্মজা খুঁজছে শুনে এতোই আনন্দিত হয়েছে মানুষটা! ব্যাপারটা তৃধাকে কষ্ট দিচ্ছে। তার বুকে চিনচিন ব্যাথা শুরু হয়।

শাহানার অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘুরাচ্ছে। সে বেশি মানুষের মাঝে থাকতে পারে না। শরীর দূর্বল লাগছে। পদ্মজার এক হাত ধরে দূর্বল কণ্ঠে বললো,'পদ্ম,আমার মাথা ঘুরাইতাছে।'
পদ্মজা বিচলিত হয়ে বললো,'বেশি খারাপ লাগছে?'
শাহানার চোখ বুজে আসছে। সে অনেক কষ্টে বললো,'মাথাত পানি দেও আমার। দেও বইন,দেও!'
স্কুলের পিছনে ঝোপঝাড় আর মাদিনী নদী আছে। একটা ঘাটও আছে। পানির ব্যবস্থা আছে। পদ্মজা শাহানার এক হাত শক্ত করে ধরে ঘাটে নিয়ে আসে। দুজন লোকও সাথে সাথে যায়। শাহানা নিকাব খুলার আগে দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বললো,'এই তোমরা আইছো কেরে? নিকাব খুইললা পানি দিমু মাথাত। যাও তোমরা।'

দুজন লোক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চলে যায়। এদিকে কেউ নেই। কেউ আসতে চাইলেও তাদের সামনে দিয়ে আসতে হবে। তাই ভয় নেই।
শাহানা নিকাব খুলে মাথায় পানি দিল। শাহানা মাথা ঝুঁকে রাখে। আর পদ্মজা দুইহাতে পানি নিয়ে শাহানার মাথায় ঢালে। কিছুক্ষণ পানি দেয়ার পর শাহানা সুস্থবোধ করে। বিশ্রাম নেয়ার জন্য সে একটু দূরে একটা গাছের গোড়ায় বসলো। পদ্মজা চারপাশ দেখে নিজের নিকাব খুললো। চোখ দুটি জ্বলছে। পানি দেয়া প্রয়োজন।

পদ্মজা যেখানে ছিল সেখানে নেই! লিখন চারপাশে চোখ বুলিয়েও পদ্মজার দেখা পেলো না। এখানে আসতে আসতে কোথায় চলে গেল?
তৃধাও খুঁজলো। স্কুলে একবার শুটিং হয়েছিল। তাই লিখন জানে স্কুলঘরের পিছনে একটা ঘাট আছে। পদ্মজা সেখানে থাকতে পারে ভেবে,সেদিকে গেলো লিখন। দুজন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে তার পাশ কেটে ভীড়ের দিকে যায়। লিখন ঘাটে এসে থামে। কারো উপস্থিতি টের পেয়ে শাহানা পিছনে ফিরে তাকায়। আবার চোখ সরিয়েও নেয়। পদ্মজা মুখ ধুয়ে পিছনে ফিরতেই দূরে লিখনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। পদ্মজার গলার দুটো ঘাড় কালো-খয়েরি দাগ,মুখের ক্ষত,চোখের-মুখের অবস্থা দিনের আলোর মতো লিখনের চোখের সামনে ভেসে উঠে। শাহানা পদ্মজার এমন অবস্থা দেখে চমকে যায়। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসেই সমাবেশে চলে এসেছে! পদ্মজার সাথে নিকাব পরা অবস্থায় কথা হয়েছে। তাই পদ্মজার এই অবস্থা সে দেখেনি। লিখনের কথা হারিয়ে যায়। বাকহারা হয়ে পড়ে সে। একেই বোধহয় বলে,পৃথিবী থমকে যাওয়া। পদ্মজা দ্রুত নিকাব পরে নিল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৭
_____
পদ্মজা এক পা,এক পা করে উপরে উঠে আসে। পদ্মজার প্রতিটি কদম লিখনের হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরায়। সে কথা বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। শাহানা পদ্মজার এক হাত ধরে বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলো,'ও পদ্ম,তোমার এই অবস্থা কেমনে হইলো?'
পদ্মজা চাপা স্বরে বললো,'বাড়িতে গিয়ে সব বলবো আপা।'

শাহানা চোখ দুটি বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার শরীরে যে দাগ সে দেখেছে,এতে নিশ্চিত কেউ পদ্মজাকে মেরেছে। গলা চেপে ধরেছে! গালে নখের আঁচড়ও রয়েছে। শাহানা স্তব্ধ হয়ে যায়। আমির পদ্মজার জন্য কতোটা পাগল সবাই জানে। আমির-পদ্মজার ভালোবাসা গল্প সবার মুখেমুখে। শাহানা,শিরিন দুজনই তাদের শ্বশুর বাড়িতে আমির-পদ্মজার ভালোবাসার গল্প করে। সেই পদ্মজার গায়ে মারের দাগ! আমিরের তো মারার কথা না,অন্য কেউও পারবে না। তাহলে কীভাবে কী হলো? শাহানার মাথায় কিছু ঢুকছে না। পদ্মজা লিখনের দিকে তাকাতেই লিখন নিঃশ্বাস ছাড়লো। নিঃশ্বাসের শব্দ উপস্থিত তৃধা,শাহানা,পদ্মজা তিন জনই শুনতে পায়। পদ্মজা তার রিনঝিনে মিষ্টি কণ্ঠে বললো,' আপনার সাথে আমার কথা ছিল।'

লিখন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে স্পষ্ট স্বরে বললো,'কী হয়েছে তোমার সাথে?'

লিখনের চোখের কার্নিশে জল জমে। পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কেউ তার মুখ দেখলে তাকে অনেক রকম প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হবে। তাই সে মুখ দেখাতে চায়নি কাউকে। পূর্ণা-প্রেমার সাথে যখন দেখা হয়, তখনও সে নিকাব খুলেনি। লিখন এক পা এগিয়ে এসে আবার প্রশ্ন করলো,' কে মেরেছে?'
পদ্মজা বুক ধুকপুক করছে। তার মিথ্যে বলায় অভ্যেস নেই। আবার সত্যটাও বলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি সেরকম নয়। পদ্মজা লিখনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃধার দিকে তাকালো। পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটা। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। তৃধা পদ্মজার শরীরের দাগ নিয়ে চিন্তিত নয়। সে আগ্রহ নিয়ে পদ্মজার চোখ দেখছে। কাঁদার কারণে ফুলে থাকলেও সৌন্দর্য হারিয়ে যায়নি। অসম্ভব সুন্দর চোখ। টানা টানা চোখ বোধহয় একেই বলে! তৃধা ঈর্ষান্বিত। পদ্মজা লিখনের প্রশ্নে বললো,'মারের দাগ হতে যাবে কেন?'
লিখন রুদ্ধশ্বাসে বললো,'মুখে দাগ,গলা চেপে ধরার দাগ,চোখ ফুলে আছে। কে বলবে এটা মারের দাগ না? আমির হাওলাদার মেরেছে?'
শাহানা চমকে যায়। রাগ হয়। শাহানা-শিরিন আমিরকে অনেক ভালোবাসে। আমিরকে নিয়ে এত বড় কথা কী করে বলতে পারে লিখন? শাহানা তেড়ে এসে রাগী স্বরে বললো,'বাবু মারবো কেরে? তুমি কিতা কও?'
পদ্মজা দ্রুত লিখনকে বললো,'সব বলব। আপনার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। আপনার সাহায্য প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে শুনুন।'
শাহানা পদ্মজার এক হাতে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো,' পর পুরুষের কাছে কিতার সাহায্য তোমার পদ্ম?'
পদ্মজা বললো,'আপা,আমি আপনাকে সব বলব। একটু সময় দিন।'

পদ্মজাকে পাহারা দেয়া দুজন লোকের নাম হাবু আর জসিম। হাবু-জসিমকে একা একা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে,রিদওয়ান পদ্মজাকে খুঁজতে থাকলো। খুঁজতে খুঁজতে ঘাটে এসে উঁকি দেয়। লিখনের সামনে পদ্মজাকে দেখে ভয়ে হয় রিদওয়ানের। লিখন দেশের একজন খ্যাতিমান অভিনেতা। সে যদি পদ্মজার মুখ থেকে সব জেনে যায়,যে কোনো মূল্যে তাদের ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগবে। আর সফলও হতে পারবে। পদ্মজা পারে না,কারণ তার স্বামী এতে জড়িত। তার দুই বোনকে নিয়ে ভয় আছে। সর্বোপরি সে একজন নারী! রিদওয়ান দূর থেকে ডাকলো,'পদ্মজা।'
রিদওয়ানের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা আশাহত হয়। লিখনের সাথে কথা যে আর দীর্ঘ হওয়া সম্ভব নয় তা স্পষ্ট। পদ্মজা তাকালো। রিদওয়ান এগিয়ে এসে বললো,'চাচা যেতে বলেছেন।'
শাহানা রিদওয়ানকে বললো,'মাথাডা ঘুরতাছিল। পদ্ম আমারে ঘাটে আইননা পানি দিছে।'
রিদওয়ান আড়চোখে লিখনকে দেখলো। লিখনের প্রতিক্রিয়া দেখলো। লিখন তাকাতেই সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। রিদওয়ানের দৃষ্টি দেখে লিখনের বিচক্ষণ মস্তিষ্ক বুঝে যায়, এই দৃশ্যে ঘাপলা আছে। পদ্মজা ভালো নেই,তার সাথে খারাপ কিছু হচ্ছে। আর রিদওয়ান সব জানে। সে জড়িত। রিদওয়ান শাহানাকে বললো 'এখন ঠিক আছো?'
শাহানা এক হাতে নিজের কপাল চেপে ধরে বললো,' হ ভাই।'
রিদওয়ান হেসে লিখনের দিকে তাকালো। করমর্দন করে বললো,' কী খবর?'
রিদওয়ানের জবাব না দিয়ে লিখন বললো,'আমি পদ্মজার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই।'
রিদওয়ান পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। তারপর লিখনের দিকে। বললো, 'কী কথা?'

'ব্যাক্তিগত। দয়া করে সুযোগ করে দিলে খুশি হবো।' লিখনের সোজাসুজি কথা।
রিদওয়ান দূরে সরে দাঁড়ালো। বললো,'পদ্মজা আমাদের বাড়ির বউ। সে যার তার সাথে বাইরে নির্জনে কথা বলতে পারে না।'
লিখনের হাঁসফাঁস লাগছে। সে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছে। নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। মন বার বার বলছে,পদ্মজা ভালো নেই! সত্যিই তো ভালো নেই। লিখন বললো,'পদ্মজা আমাকে কিছু বলতে চায়।'
রিদওয়ান পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আদেশের স্বরে বললো,'পদ্মজা চলো।চাচা ডাকে।'
পদ্মজা রিদওয়ানকে মোটেও ভয় পায় না। রিদওয়ানের আদেশ শোনা তো দূরের কথা। তবে এই মুহূর্তে কিছুতেই লিখনের সাথে কথা বলা সম্ভব নয়। তাই সে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই লিখন পথ আটকে দাঁড়ায়। তার গলার স্বর চড়া হয়,' আমাকে বলে যাও তোমার গলায় কীসের দাগ? মুখে কীসের দাগ? কে মেরেছে?'

'কে মেরেছে?' প্রশ্নটা কানে আসতেই রিদওয়ানের গলা শুকিয়ে যায়। এতকিছু কী করে লিখন দেখলো? পদ্মজা দেখিয়েছে? এভাবে বাইরের পুরুষ মানুষকে নিজের গলা দেখিয়েছে! রিদওয়ান তার আসল রূপ,ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বললো,' তুমি না সতীসাবিত্রী! পর-পুরুষকে গলা দেখিয়ে বেড়াও আমির জানে?'
লিখনের মাথা চড়ে যায়। সে শেষ কবে নিজের ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সে জানে না। তবে আজ হারিয়েছে। তার কাছে পরিষ্কার, পদ্মজা অত্যাচারিত! তার উপর জুলুম করা হয়। লিখন রিদওয়ানের শার্টের গলা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,'মুখ সামলিয়ে কথা বলুন।'
রিদওয়ান লিখনকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। লিখনের ঝাঁকরা চুল কপালে ছড়িয়ে পড়ে।
রিদওয়ান বললো,' অন্যের বউয়ের উপর নজর দেয়া বন্ধ করুন। পদ্মজা চলো।' রিদওয়ান পদ্মজার হাত চেপে ধরে। পদ্মজা এক ঝটকায় রিদওয়ানের হাত সরিয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বললো,' আমি একাই যেতে পারি।'
তারপর লিখনকে বললো,'কথা বাড়াবেন না। আমাকে যেতে দিন।'
লিখন কারো কথা শুনতে রাজি নয়। সে তার ধৈর্য্য,ব্যাক্তিত্ব থেকে সরে এসেছে। লিখন আবারও পদ্মজার পথ আটকালো। প্রশ্ন করলো,'কাকে ভয় পাচ্ছো তুমি? আমাকে বলো।'
শাহানা নিজেও অবাক পদ্মজার অবস্থা দেখে। কিন্তু লিখনের পদ্মজাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগছে না। অন্য পুরুষ কেন তাদের বাড়ির বউয়ের জন্য এতো আকুল হবে? শাহানা কর্কশ কণ্ঠে লিখনকে বললো,'আপনে পথ ছাড়েন না ক্যান? অন্য বাড়ির বউরে এমনে আটকানি ভালা মানুষের কাম না।'

লিখনের চোখেমুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট! অন্য বাড়ির বউ! অন্যের বউ! এই শব্দগুলো কেন পৃথিবীতে এসেছে? সহ্য করা যায় না। রিদওয়ান লিখনকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইলো। লিখন রিদওয়ানের হাতে ধরে ফেলে। রিদওয়ানের মুখের কাছে গিয়ে চাপাস্বরে বললো,'পদ্মজা আমার হৃদয়ে যত্নে রাখা জীবন্ত ফুল। তার গায়ে আঘাত করার সাহস যে করেছে তাকে আমি টুকরো টুকরো করবো।'
লিখনের হুমকি রিদওয়ানের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আমিরকে সহ্য করে, কারণ আমির ঠান্ডা মাথার খুনী। চোখের পলকে যে কাউকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা,পাতালঘর, বাড়ি,অফিস,গোডাউন সবকিছুর একমাত্র মালিক আমির। তাই রিদওয়ান রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তাই বলে সাধারণ জগতের একজন অভিনেতার হুমকি সহ্য করবে?

কিছুতেই না। রিদওয়ান লিখনের চোখে আগুন চোখে তাকিয়ে বললো,' এসব সিনেমায় গিয়ে বলুন। নাম বাড়বে।'
লিখন রিদওয়ানকে ছেড়ে পদ্মজার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বললো,' পদ্মজা তুমি তো ভীতু না। ভয় পেয়ো না। আমাকে বলো কী হয়েছে তোমার সাথে?'
পদ্মজা বললো,'আমি কাউকে ভয় পাচ্ছি না। আপনার সাথে পরে কথা বলব।'
রিদওয়ান পদ্মজার দিকে তেড়ে এসে বললো,'পরে কীসের কথা?'
রিদওয়ান পদ্মজার মুখের উপর ঝুঁকেছে বলে লিখনের রাগ বাড়ে। সে রিদওয়ানের পিঠের শার্ট খামচে ধরে। সঙ্গে,সঙ্গে রিদওয়ান লিখনের মুখ বরাবর ঘুষি মারলো। তৃধা,পদ্মজা,শাহানা চমকে যায়। তৃধা আতঙ্কে লাল হয়ে যায়। সে দৌড়ে এগিয়ে আসে। লিখন তার ঘোলা চোখ দিয়ে রিদওয়ানের উপর অগ্নি বর্ষিত করে। রিদওয়ানকে তার ঘুষি ফিরিয়ে দেয়। দুজন মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। তৃধা,পদ্মজা কেউ থামাতে পারে না। আর কিছু সময় এভাবে চললে,কেউ একজন খুন হয়ে যাবে। শাহানা চিৎকার করতে করতে স্কুলের সামনে ছুটে যায়। তার চিৎকার শুনে উপস্থিত মানুষদের মাঝে হট্টগোল শুরু হয়। শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। মজিদ,খলিল ছুটে আসে স্কুলের পিছনে। পরিচালক আনোয়ার হোসেন লিখনকে মারামারি করতে দেখে খুব অবাক হোন। সবাই মিলে লিখন ও রিদওয়ানকে থামালো। তারপর দুজনকে নিয়ে স্কুলের সামনে আসে। উপস্থিত মানুষরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। গুরুজনরা জিজ্ঞাসা করে,তারা কেন মারামারি করছিল? মজিদ হাত তুলে সবাইকে থামালেন। তারপর রিদওয়ানের দিকে তাকালেন। রিদওয়ান চোখের ইশারায় কিছু বলছে। কিন্তু মজিদ বুঝতে পারেননি। তিনি রিদওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন,' কী সমস্যা রিদওয়ান? এমন অসভ্যতামির মানে কী?'
রিদওয়ান বাঁকা চোখে উপস্থিত মানুষদের দেখলো। সবাই তাকিয়ে আছে। আজ কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে নিশ্চিত! রিদওয়ান মাথা নীচু করে বললো,'লিখন শাহ পদ্মজার পথ আটকাচ্ছিল।'
রিদওনায়ের কথা শুনে মানুষদের মুখ থেকে লিখনের উদ্দেশ্যে ছিঃ,ছিঃ বেরিয়ে আসে। লিখন হতবাক হয়ে যায়। হতবাক হয় পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত, পদ্মজা। মজিদ লিখনকে প্রশ্ন করলেন,'রিদওয়ান যা বলছে সত্য?'
লিখন পদ্মজার চোখের দিকে তাকালো। তারপর বললো,' সত্য। কিন্তু আমি পদ্মজার গলায়,মুখে দাগ দেখেছি। গলায় যে দাগ সেই দাগ দেখে বুঝা যায় তার গলা কেউ চেপে ধরেছিল। মুখে ক্ষত,নখের আঁচড়। চোখ ফোলা। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম এসব কী করে হয়েছে? কে মেরেছে?'
লিখনের কথা শুনে মজিদের মাথা ঘুরে যায়। আমির বলেছিল,পদ্মজাকে সমাবেশে না আনতে। এতে সমস্যা হতে পারে। মজিদ আমিরের কথায় গুরুত্ব দেননি। ভেবেছেন,পদ্মজা গ্রামে আছে সবাই জানে। আর গত সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, পরবর্তী সমাবেশে আমির বা পদ্মজা বিতরণ করবে শীতবস্ত্র। আমির তো চলে গেল। তাই পদ্মজাকে এনেছেন। আর এই সমাবেশে বাড়ির মেয়ে-বউরা অসুস্থ থাকলেও উপস্থিত থাকে। যদি কেউ প্রশ্ন করে,আমিরের বউ কোথায়? প্রশ্নটা সহজ,উত্তরও বানিয়ে দেয়া যেত। তবুও মজিদ হাওলাদার প্রশ্ন এড়াতে পদ্মজাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রশ্ন শুনতে পছন্দ করেন না।
মজিদের মুখের রঙ পাল্টে যাওয়াটাও লিখনের চোখে পড়ে। সে ভেবে নেয়,এ সম্পর্কে মজিদও জানে। সে সবার সামনে প্রশ্ন করে, 'আপনার বাড়ির বউয়ের শরীরে মারের দাগ কী করে এলো?'
মজিদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়। তিনি কাঠ কাঠ স্বরে বললেন,'তুমি কী করে দেখেছো?'
'পদ্মজা ঘাটে নিকাব খুলে মুখে পানি...'
মজিদ লিখনের কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন,'তুমি বাড়িতে এসো এ নিয়ে কথা হবে।'

মজিদ ভেতরে ভেতরে ভয়ে জমে গিয়েছেন। পদ্মজা যদি মুখ খুলে কী হবে? এখানে মজিদের প্রতিপক্ষরাও রয়েছে। তারা সুযোগ নিবে। লিখন কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। তার পূর্বে মজিদের নতুন প্রতিপক্ষ ইয়াকুব আলী বললেন,'বাড়ির বউয়ের গায়ে মারের দাগ! এটা তো ভালো কথা না। মাতব্বর কি ছেলের বউয়ের উপর অত্যাচার করে?'

মজিদ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন! পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে। যে করেই হউক পরিস্থিতি হাতে আনতে হবে। মজিদ ইয়াকুব আলীকে হেসে বললেন,' অহেতুক কথা বলবেন না। আমাদের বাড়িতে বউরা রানির মতো থাকে। গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই আসে না। কথা বলার পূর্বে বিবেচনা করে বলবেন।'
ইয়াকুব আলী হাসলেন। বললেন,'তাহলে কী নায়ক সাহেব মিথ্যা বলছেন?'
ইয়াকুব আলীর সাথে আরো দুজন তাল মিলিয়ে বললো,'আমরা সত্যটা জানতে চাই।'
হাওলাদারদের অবস্থায় দরজার চিপায় পড়ার মতো। পদ্মজা তাদের অবস্থা দেখে মুচকি হাসে। পদ্মজার শরীরে মারের দাগ আছে! এ কথা শুনে পূর্ণা মানুষজনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে উঁচু মাটির টিলার উপর উঠলো। পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললো,'আপা? লিখন ভাই কী বলছে?'
পদ্মজা নিরুত্তর। খলিল উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সব না সবাই জেনে যায়! আতঙ্কে তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন,'লিখন শাহ মিছা কথা কইতাছে।'

খলিলের কথা শুনে মজিদের ইচ্ছে হয় খলিলকে জুতা দিয়ে পিটাতে। লিখন বললো,'এইটুকুও মিথ্যা না। দাগগুলো এখনো তাজা। পদ্মজা তো সামনেই আছে।'
একজন বয়স্ক মহিলা বললেন,'পদ্ম মার নিকাবডা সরাইলেই হাচামিছা জানা যাইবো।'
মজিদ জানতেন কেউ এরকম কিছুই বলবে। এখন প্রমাণিত হয়ে যাবে খলিল মিথ্যা বলেছে! মজিদের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। তিনি কী করবেন? কী বলবেন? বুঝতে পারছেন না। পদ্মজা চেয়েছিল অন্যভাবে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করতে। যেহেতু সবার সম্মুখে সব প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে সেহেতু উচিত সব ফাঁস করে দেয়া। এতে সব শুনে কেউ না কেউ মেয়েগুলোকে উদ্ধার করতে পদক্ষেপ নিতে পারবে। সে পুরো নিকাব না খুলে শুধু মুখটা উন্মুক্ত করলো। তার মুখের স্পষ্ট,কালসিটে দাগগুলো দেখে মানুষজনের কোলাহল বেড়ে যায়। সবাই ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকে। পূর্ণা পদ্মজার গালের একটা ক্ষত দেখেছে। শুনেছিল তো দূর্ঘটনায় এমন হয়েছে। নখ ডেবে যাওয়া দুটো দাগ আর চোখের অবস্থা দেখে তার বুক ছ্যাঁত করে উঠে। সে পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিকাব তুলে গলা দেখে চমকে যায়। অশ্রুসজল চোখে পদ্মজা দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ডাকে,'আপা!'
ইয়াকুব আলী খুব অবাক হয়েছেন এরকম ভান করে বললেন,'মেয়েটার কী অবস্থা! মাতব্বর এভাবেই কী বউদের রানী করে রাখেন?'

মজিদের বুকের ব্যাথা বাড়ে। এক পা পিছিয়ে যান। কী হচ্ছে এসব! রিদওয়ান জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। সে পদ্মজার ভাব দেখে ধারণা করছে,পদ্মজা এখুনি সব বলে দিবে। আর সব শোনার পর এত মানুষের সাথে তাদের পেরে উঠা সম্ভব নয়। রিদওয়ান ঢোক গিলে আচমকা বলে উঠলো,'আমির মেরেছে। এমনি এমনি মারেনি! পদ্মজার লিখন শাহর সাথে ছয় বছর আগে সম্পর্ক হয়েছিল। বিয়ের পরও লুকিয়ে ঢাকা অবৈধ মেলামেশা করে গেছে। আমির কয়দিন আগে হাতেনাতে ধরেছে। আর তাই মেরেছে।'

রিদওয়ানের কথা শুনে পদ্মজা ও লিখনের মাথায় যেন বাজ পড়ে। মজিদের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠে। রিদওয়ান বাঁচার পথ খুঁজে দিয়েছে! মানুষজনের কোলাহল দ্বিগুণ হয়। মজিদ কখনো ভাবেননি,তার পরিবার নিয়ে আবারো এমন সভা হবে! যা হওয়ার হয়ে গেছে,পদ্মজার সম্মান উৎসর্গ করে হলেও তাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। লিখন ক্রোধে-আক্রোশে রিদওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাবু,জসিম সহ আরো কয়েকজন লিখনকে আটকায়। লিখন চেঁচিয়ে বললো,'মিথ্যাবাদী।'
কেউ একজন বললো,'মাতব্বর সাহেব,সত্যিডা খুলে বলেন।'
মজিদ হাওলাদার কেশে সবার উদ্দেশ্যে বললেন,'আমি চাইনি,আমার বউয়ের কোনো দূর্নাম হউক। হাজার হউক সে আমার একমাত্র ছেলের বউ। কিন্তু পরিস্থিতি যখন বাধ্য করছে তখন না বলে উপায় নেই। আপনারা অনেকেই জানেন,মোড়ল বাড়িতে লিখন শাহ একবার শুটিং করতে এসেছিল। তখন পদ্মজা আর লিখন শাহর মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর আমার ছেলে আমিরের সাথে পদ্মজার বিয়ে হয়। আমির পদ্মজাকে নিয়ে ঢাকা চলে যায়। ঢাকা লিখন শাহের সাথে পদ্মজার অবৈধ সম্পর্ক চলতে থাকে। আমার বোকা ছেলে কখনো ধরতে পারেনি। গ্রামে আসার পর লিখন শাহ দুইবার আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। প্রমাণ আছে কিন্তু। অনেকেই দেখেছেন। দেখেছেন তো?'

কয়েকজন বলাবলি করলো, তারা দেখেছে! মজিদ বললেন,' লিখন শাহ কিন্তু পদ্মজার জন্য যেত। একদিন রাতেও যায়। তখন আমির হাতেনাতে ধরে দুজনকে। তাই আমির পদ্মজার গায়ের উপর হাত তুলে। রাগে একটু মার দেয়। এতে কী কোনো দোষ হয়ে গেছে আমার ছেলের?'

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো চিৎকার করে উঠে,'মিথ্যা কথা। আপনি বানিয়ে কুৎসা রটাচ্ছেন।'
মজিদ হাওলাদার বুকভরা নিঃশ্বাস নেন। তিনি জানেন,এই গ্রামবাসী তাকে কতোটা বিশ্বাস করে। আর লিখনকেও অনেকে বাড়িতে যেতে দেখেছে। পদ্মজার নামে একবার সালিশ বসেছিল। যদিও সেটা তার ছেলের সাথে তবে মেয়ে নির্দোষ হলেও তার একবারের বদনাম সারা জীবন রয়ে যায়! তিনি সবার সামনে দুই হাত তুলে নরম স্বরে বললেন,'আমার আর কিছু বলার নেই। বিশ্বাস, অবিশ্বাস আপনাদের উপর।'

লিখন হাবু ও জসিমকে আঘাত করলো। রিদওয়ান লিখনকে চেপে ধরে। রিদওয়ানের ইশারায় আরো কয়েকজন লিখনকে জাপটে ধরে। পরিচালক আনোয়ার হোসেন মাথা নিচু করে ফেলেন। মজিদ হাওলাদার মিথ্যা বলবেন না! তিনি মহৎ মানুষ। লিখন একটা মেয়ের জন্য পাগল সেটা তিনিও জানতেন। মজিদের কথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে তিনি লিখনকে সৎ চরিত্রের ছেলে ভাবতেন। মুহূর্তে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দ্বিতীয়বারের মতো পদ্মজার চরিত্রে ছিঃ,ছিঃ ধিক্কার ছুঁড়ে মারে গ্রামবাসী। কেউ যেন গায়ে হাত না দিতে পারে,আত্মরক্ষার জন্য পদ্মজা কোমরে ছুরি খুঁজলো! ছুরি নেই। সে অসহায় হয়ে পড়ে। চিৎকার করে সবার উদ্দেশ্যে বললো,'সবাই আমার কথা শুনুন।'
কেউ পদ্মজার কথা শুনলো না। সবার চেঁচামিচিতে তার গলার স্বর কারো কানেই যায় না। মজিদ হাওলাদারকে তারা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। নিয়তি পদ্মজার সম্মানে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত হানে!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৮

_____

মজিদ হাওলাদার দুই হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তাৎক্ষণিক কোলাহল কমে আসে। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন,'আমার ঘরের বিচার আমার ঘরে হবে। আমি আর এ বিষয়ে কথা বাড়াতে চাই না। রিদওয়ান, পদ্মজাকে বাড়ি নিয়ে যাও।'
রিদওয়ান পদ্মজাকে ছুঁতে উদ্যত হতেই লিখন চেঁচিয়ে বললো,'পদ্মজা যাবে না।'
লিখন পদ্মজার জন্য ভয় পাচ্ছে। হাওলাদার বাড়ির মানুষগুলো কত বড় মিথ্যাবাদী সে আজ টের পেয়েছে। এতো বড় মিথ্যে চাপিয়ে দিলো, নিজেদের কুকর্ম লুকোতে! মজিদ হাওলাদারের মিথ্যা অভিনয় তাকে অবাক করেছে খুব। এরা পদ্মজাকে বাড়ি নিয়ে কী করে কে জানে! রিদওয়ান লিখনের কথা শুনলো না। সে পদ্মজাকে ধমকের স্বরে বললো,'বাড়ি চলো।'
তারপর হাত ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজাও রিদওয়ানের হাত চেপে ধরলো। চাপাস্বরে বললো,'ছয় বছর আগের অপবাদ আবার আমার জীবনে নিয়ে আসার জন্য আপনার মতো নরপশুদের অভিশাপ! কিন্তু এবার না আমাকে না আমার বোনদের, কাউকে ছোঁয়ার সাহস কেউ দেখাতে পারবে না।'
পদ্মজা রিদওয়ানের মুখের উপর থুথু ছুঁড়ে মারে। উপস্থিত মানুষজন চমকে যায়। কোলাহল দ্বিগুণ হয়। রিদওয়ান পদ্মজার দিকে আগুন চোখে তাকায়। তার উপর হাত তোলার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল পূর্ণা। সে আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। রিদওয়ানের পূর্বে রিদওয়ানের গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় বসিয়ে দিল। পূর্ণার আকস্মিক ব্যবহারে সবাই চমকে যায়। চারিদিকে চেঁচামিচি শুরু হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। রিদওয়ান রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সে পূর্ণার গলা চেপে ধরে। শিরিন ভয়ে চিৎকার করে উঠে,'ও আল্লাহ! আল্লাহর গযব পড়ছে এইহানে! গযব পড়ছে!'
তারপর দ্রুত সরে যায়। শাহানা,খলিল রিদওয়ানকে আটকানোর চেষ্টা করে। রিদওয়ান রাগে কিড়মিড় করছে। খলিল চাপাস্বরে রিদওয়ানের কানে কানে বললেন,'রিদু পূর্ণারে ছাড়,মানুষ দেখতাছে।'
রিদওয়ান ছাড়লো না। পদ্মজা জানে,এই মুহূর্তে সে হাওলাদার বাড়ির মানুষদের আঘাত করলে গ্রামবাসী ভালো চোখে দেখবে না। তবুও রিদওয়ানকে আঘাত করার জন্য বাধ্য হতে হয়। পদ্মজা রিদওয়ানের পেট বরাবর জোরে লাথি বসায়। রিদওয়ান ছিটকে সরে যায়। দুই হাতে পেট চেপে ধরে। শাহানা 'ও মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। পূর্ণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

মৃদুল গফুর মিয়াকে নিয়ে স্কুলের দিকে আসছিল। দূর থেকে দেখতে পেল মাঠের মানুষজন অস্থির হয়ে আছে। সে গফুর মিয়াকে বললো,'
আব্বা, আপনি আসেন। আমি আগে যাইতাছি।'

তারপর দৌড়াতে থাকে। স্কুলমাঠে পৌঁছাতেই উঁচু টিলায় রিদওয়ানকে পূর্ণার গলা চেপে ধরতে দেখলো। তার রক্ত মাথায় উঠে যায়। শরীরে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দেয়। এদিকওদিক খুঁজে একটা মাঝারি আকারের বাঁশ পেল। সে দ্রুত বাঁশ নিয়ে দৌড়াতে থাকে। এক হাতে লুঙ্গি ধরে, যা হাঁটু অবধি উঠে আসে। মৃদুলের দৌড়ের গতিতে অনেক মানুষ ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে। মৃদুলের চোখের দৃষ্টি রিদওয়ানের দিকে। তার মস্তিষ্ক এলোমেলো। মজিদ দ্রুত পদ্মজা-রিদওয়ানের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন,'কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? থামো সবাই।'

কিন্তু কোনোকিছুই থামলো না। মৃদুলের উপস্থিতি সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। সে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে টিলার উপর। বাঁশ দিয়ে রিদওয়ানকে আঘাত করতে গিয়ে শাহানা,খলিলসহ আরো দুজন লোককে আঘাত করে বসে। মজিদ দ্রুত টিলা ছেড়ে সরে যান। মৃদুল খুব রাগী! মৃদুলের এলাকার অনেকে মৃদুলকে মাথা খারাপ বলে। সে কখনো বুদ্ধি দিয়ে কিছু করে না। সবসময় ক্রোধকে মূল্য দেয়। রাগের বশে কখন কী করে নিজেও জানে না। মানুষজন ছোটাছুটি করে পালাতে থাকে। শুধু মৃদুলের হুংকার শোনা যায়। ক্রোধ থাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সে রিদওয়ানকে বলছে,'জার*** বাচ্চা,তুই কার গায়ে হাত দিছস! তোরে আজ আমি মাটির ভিত্রে গাঁইথা ফেলমু।'

আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা মজিদ হাওলাদারের লোকেরা মৃদুলকে ধরতে দৌড়ে আসে। তৃধা ভয়ে দূর থেকে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। আনোয়ার হোসেন তৃধার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তৃধার মাথায় হাত রাখলেন। আনোয়ার হোসেনের দিকে তাকিয়ে তৃধা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো,'লিখনকে কেন ছাড়ছে না ওরা?'
আনোয়ার হোসেন টিলার উপর চোখ রেখে বললেন,'জানি না মা। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কেউ খুন হয়ে যাবে এখানে। লিখন যে কেন এসবে জড়িয়ে পড়লো!'
আনোয়ার হোসেনের কণ্ঠে আফসোস। তৃধা মাটিতে বসে। তার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে। চার-পাঁচজন লোক লিখনকে জাপটে ধরে রেখেছে। লিখন ছটফট করছে ছোটার জন্য। এই দৃশ্য সে সহ্য করতে পারছে না।

পদ্মজা পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো। পূর্ণা ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। পদ্মজার বুক জ্বলছে। পূর্ণার কষ্ট তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মৃদুল রাগে আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করছে। রিদওয়ানকে ধরতে পারলে,সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু পারছে না। টিলার উপর পনেরো-বিশ জনের একটা জটলা লেগে যায়। হাতাহাতি,ধ্বস্তাধস্তি চলে বিরতিহীনভাবে। মজিদ চোখের চশমাটা ঠিক করে ঠান্ডা মাথায় ভাবলেন। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি হাতে আনা ভীষণ জরুরি! নয়তো অনেক বিপদ ঘটে যেতে পারে। তিনি তার ডান হাত রমজানকে ডেকে ফিসফিসিয়ে কিছু বললেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে জটলার মাঝখান থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে। শব্দ তুলে লিখন শাহর দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তার পিঠ থেকে রক্তের ধারা নামছে। মৃদুল আকস্মিক লিখনকে এভাবে পড়তে দেখে চমকে যায়। রিদওয়ান লিখনকে আহত হতে দেখে মজিদের দিকে তাকালো। তার মুখ রক্তাক্ত। মৃদুল এতজনকে উপেক্ষা করেও তাকে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে! মজিদ ইশারায় রিদওয়ানকে কিছু একটা বুঝালেন। রিদওয়ান তাৎক্ষণিক পদ্মজাকে খুঁজলো। দেখলো,পদ্মজা মাটিতে পড়ে আছে। তার চোখ দুটি বোজা। মজিদের একটা পদক্ষেপ পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিল! লিখন হয় মারা যাবে,নয়তো অনেকদিন হাসপাতালে পড়ে থাকবে। আর পদ্মজাকে একবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলেই হলো। আর মুক্তি পাবে না! রমজান সবার আড়ালে দ্রুত ঘাটে গেল। রক্তমাখা ছুরি আর হাতের রুমাল নদীতে ছুঁড়ে ফেললো।

_____
এশারের আযান পড়ছে। পদ্মজা ধীরে ধীরে চোখ খুললো। নিজেকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করলো। মাথা ব্যথা করছে খুব। সে এক হাতে কপাল চেপে ধরে। তখনই দুপুরের সব ঘটনা মনে পড়ে যায়। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে, তখন কে যেন পিছন থেকে মুখে কিছু একটা চেপে ধরে। তারপর আর কিছু মনে নেই! পদ্মজা দ্রুত উঠে বসে। জুতা না পরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় লতিফার দেখা পেল। লতিফা পদ্মজাকে দেখে বললো,'কই যাইতাছো?'

'পূর্ণা কোথায়? পূর্ণার কাছে যাব।'
'পূর্ণা তো উপরে।'
পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে,'উপরে মানে? তিন তলায়?'
'হ।'
'এখানে কে নিয়ে আসলো?'
পদ্মজা প্রশ্ন করলো ঠিকই,উত্তরের আশায় থাকলো না। দৌড়ে তিন তলায় চলে গেল। তিন তলার একটা ঘরেই পালঙ্ক আছে। রুম্পা যে ঘরে ছিল! পদ্মজা সেই ঘরে এসে মৃদুলকে দেখতে পেল। মৃদুল চেয়ারে বসে আছে। বিছানায় শুয়ে আছে পূর্ণা। পদ্মজা উল্কার গতিতে পূর্ণার মাথার কাছে গিয়ে বসলো। মৃদুল পদ্মজাকে দেখে সংকুচিত হয়। বললো,' পূর্ণা ভালা আছে ভাবি।'
'ও কি অজ্ঞান?'
'না,ঘুমাইতাছে। কিছুক্ষণ আগে সজাগ ছিল।'
'খেয়েছে? '
'হুম। আপনার ধারে অনেক্ষন বইসা ছিল।'
পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর পূর্ণার গালে,কপালে চুমু দিল। মৃদুলকে প্রশ্ন করলো,'প্রেমা,প্রান্ত কোথায়?'
'বাড়িত গেছে।'
'ঠিক আছে ওরা?'
'জি ভাবি।'
'আর লিখন শাহ?'
লিখন শাহর কথা শুনে মৃদুল চুপ হয়ে যায়। পদ্মজা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলো,' উনি কোথায়? কেমন আছেন?'
মৃদুল মাথা নত করে বললো,"ভাবি,ভীড়ের মাঝে কেউ একজন ভাইরে ছুরি মারছে!'
পদ্মজা এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে। তারপর কাঁপা স্বরে বললো,'বেঁচে আছে?'
'জানি না ভাবি। হাসপাতালে নিয়া গেছে সবাই। পুলিশ আইছিল বিকালে।'
পদ্মজার চোখে জল টলমল করে উঠে। মানুষটা এতদিন তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে গেছে। ধৈর্য্য ধরে থেকেছে। কঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে তার জন্য ভালোবাসা যত্ন করে রেখেছে। পদ্মজা সবকিছু জানে। সব জেনেও সে কিছু করতে পারেনি। ভালো তো করতে পারলো না উল্টে তার জন্য ক্ষতি হয়ে গেল! পদ্মজার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। দ্রুত সে জল মুছে ফেললো। আফসোস হচ্ছে! ঘাটে কথা বলা একদম ঠিক হয়নি! মেয়েগুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে ভেবে,সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আর লিখনও আজ এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল!

সব ভাগ্যে লেখা ছিল। তাই হয়তো হয়েছে। কখনো হায়-হুতাশ করতে নেই। তাই পদ্মজা সিদ্ধান্ত নিল,সে লিখনের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। যেন সে সুস্থ হয়ে উঠে। লিখনের জন্য পদ্মজার প্রার্থনা করা দায়িত্ব! পদ্মজার কাছে এইটুকু অধিকার লিখনের আছে! পদ্মজা মৃদুলকে বললো,'পূর্ণা ঘুমাক তাহলে। দেখে রাখবেন। আমি আসছি।'
'আচ্ছা ভাবি।'
পদ্মজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মৃদুল দরজার বাইরে তাকিয়ে রইলো। পদ্মজাকে তার অনেক প্রশ্ন করার আছে। লিখন-পদ্মজার নামে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে সেটা যে মিথ্যা মৃদুলের চেয়ে ভালো কে জানে! সে নিজের চোখে দেখেছে লিখন শাহর কষ্ট,পদ্মজার সম্মান রক্ষার্থে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা,একটু কথা বলার আশায় ছটফট করা! এতো বড় মিথ্যা অপবাদ

হাওলাদার বাড়ির মানুষেরা কেন দিল? আর পদ্মজার গায়ের দাগগুলো সেগুলোই কীসের? আমির হাওলাদার কোথায়? মৃদুলের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে যায় লতিফার আগমনে। লতিফা খাবারের প্লেট টেবিলের উপর রাখলো। তারপর বললো,'পূর্ণার খাওন দিয়া গেছি। আর আপনের আম্মা কইছে নিচে যাইতে।'
মৃদুল বললো,'একটু পরে যামু। আম্মা-আব্বায় খাইছে?'
'হ,খাইছে।'
'অন্যরা খায় নাই?'
'সবাই খাইছে। রিদু ভাইজানে বাড়িত নাই।'
'কু** বাচ্চা লুকাইছে।'
লতিফা আড়চোখে মৃদুলকে দেখলো। মৃদুল রাগে ছটফট করছে। এক হাত দিয়ে আরেক হাত খামচে ধরে রেখেছে। লতিফা বললো,'আপনের আম্মার মেজাজ ভালা না।'
'কেন? কী অইছে?'
'কইতে পারি না। আপনের আব্বার লগে চিল্লাইতে হুনছি।'
মৃদুলকে চিন্তিত হতে দেখা গেল না। তার আম্মা একটু বদরাগী। সব সময় চেঁচামেচি করে। এতে সে অভ্যস্ত। মৃদুল লতিফাকে বললো,' আমির ভাই কই আছে?'
'ঢাকাত গেছে। কুনদিন আইবো জানি না।'
'আচ্ছা,যাও এহন।'

লতিফা জায়গা ত্যাগ করলো। মৃদুল ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার কাছে গেল। জানালার কপাট খুলে দিল। আজ চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না রাত। সে পূর্ণাকে ভালোবাসার কথা বলার জন্য এমন একটা রাতের অপেক্ষা করেছিল। জানালা খুলে দেয়াতে চাঁদের আলো পূর্ণাকে ছুঁয়ে দেয়ার সুযোগ পায়। চাঁদ তার নিজস্ব মায়াবী আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পূর্ণার সারামুখে। পূর্ণার চোখমুখ সেই আলোয় চিকচিক করে উঠে। অন্যরকম সুন্দর দেখায়। মৃদুল পূর্ণার পাশে এসে বসলো। পূর্ণার মুখের দিকে তাকাতেই, মৃদুলের চোখে ভেসে উঠে,রিদওয়ান কীভাবে পূর্ণার গলা চেপে ধরেছিল! মৃদুলের মেজাজ চড়ে যায়। রিদওয়ানকে সে যতক্ষণ ইচ্ছামত পেটাতে না পারবে শান্তি মিলবে না! মৃদুল অনেকক্ষণ রিদওয়ানকে খুঁজেছে। পেল না। মৃদুল ছটফট করতে করতে বিড়বিড় করলো,'হারামির বাচ্চা!'

পূর্ণা ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠে। একপাশ হয়। পূর্ণার দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। প্রান্ত পূর্ণাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে। বাসন্তী বাড়িতে একা। তিনি কিছুই জানেন না। তখন মজিদ বললেন,পূর্ণাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলে বেশি ভালো হবে। পদ্মজা সেখানে আছে। মৃদুলও রাজি হয়ে যায়। তার কাছাকাছি থাকবে পূর্ণা এর চেয়ে আনন্দের কী হতে পারে! প্রান্ত মেনে নিল। এই মুহূর্তে মৃদুলই পূর্ণার অভিভাবক। মৃদুল বুঝতে পারেনি ,মজিদ হাওলাদার ভালো মানুষি দেখাতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। যাতে গফুর মিয়া বা মৃদুল অথবা গ্রামবাসী কেউই মজিদকে দোষী না ভাবে। মজিদ সবাইকে নিজের উদারতা দেখিয়েছেন। গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,পদ্মজা দোষী হলেও তার বোন দোষী নয়। রিদওয়ান পূর্ণার সাথে অন্যায় করেছে। এজন্য রিদওয়ানের শাস্তি হবে। তিনি রিদওয়ানকে সবার সামনে থাপ্পড় দিয়েছেন। আর বলেছেন,পূর্ণা সুস্থ হলে পূর্ণার কাছে ক্ষমা চাইবে রিদওয়ান।
মৃদুল কল্পনা থেকে বেরিয়ে পূর্ণার এক হাত মুঠোয় নিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করলো,'তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া যাও। আমি তোমারে নিয়া যাইতে আইছি।'

মৃদুল পূর্ণার হাতে আলতো করে স্পর্শ করতে করতে তার মায়াবী মুখখানা মুখস্থ করে নিল। মৃদুলের ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজার মতো পূর্ণার কপালে চুমু এঁকে দিতে। কিন্তু সেই বৈধতা বা সাহস তার নেই। সে পূর্ণার এক হাত শক্ত করে ধরে রাখলো।

পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করতেই মৃদুল বিজলির গতিতে পূর্ণার হাত ছুঁড়ে ফেলে। তারপর নিঃশ্বাসের গতিতে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার ঘুম ভেঙে যায়। মৃদুল এতো জোরে হাত ছুঁড়েছে, ঘুম তো পালানোরই কথা! পদ্মজা অবাক হয়ে মৃদুলকে দেখলো। এতো ভয় পাওয়ার কী হলো! পূর্ণা চোখ খুলে পদ্মজাকে দেখে খুব খুশি হয়। সে দ্রুত উঠে বসলো। পদ্মজা পূর্ণার পাশে গিয়ে বসে। পূর্ণা শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে বললো,'আপা।'
পদ্মজা মৃদু হেসে বললো,'বোন আমার!'
তারপর পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বললো,'কষ্ট হচ্ছে?'
পূর্ণা মৃদুলকে দেখলো তারপর পদ্মজাকে বললো,' না আপা।'
মৃদুল উসখুস করতে করতে বললো,'আমি তাইলে যাই ভাবি। ওইখানে পূর্ণার খাবার আছে।'
পদ্মজা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। মৃদুল দরজার বাইরে গিয়ে পূর্ণার দিকে তাকালো একবার। পূর্ণার বদলে সে পদ্মজাকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। মৃদুল জোরপূর্বক হেসে জায়গা ছাড়লো।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭৯
____
রাতের আঁধারে চারদিকে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। শাহানা ঘুমানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। মৃদুলের অনিচ্ছাকৃত আঘাতে ডান হাতের বাহু ফুলে গেছে। হাড়ে তীব্র ব্যাথা। হাত নাড়ানো যাচ্ছে না। শাহানা বিড়বিড় করে বিলাপ করছে,'আল্লাহগো, আল্লাহ এত্ত বেদনা ক্যারে দিছো তুমি? কমায়া দেও আল্লাহ।'
ঘুমের ঘোরে শিরিন শাহানার হাতের উপর উঠে পড়ে। শাহানা 'আল্লাহগো' বলে চিৎকার করে উঠলো। শিরিনের ঘুম ভেঙে যায়। সে লাফিয়ে উঠে বসে। তার চোখেমুখে ভয়। শাহানার হাত ধরতে চাইলে শাহানা চিৎকার করে বললো,'ছুঁবি না আমারে! ডাইনি,মাইরা দিছে আমারেগো।'
শিরিন অপরাধী স্বরে বললো,'আমি দেখছি না আপা।'
' তুই কথা কইবি না।'
শাহানার চোখমুখ কুঁচকানো। সে প্রচণ্ড রেগে আছে। ধীরে,ধীরে বিছানা থেকে নামলো। শিরিন প্রশ্ন করলো,'কই যাও?'
শাহনা পূর্বের স্বরেই বললো,'মুততে যাই।'
শাহানার ঝাড়ি খেয়ে শিরিন আর কথা বললো না। সে অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। শাহানা টয়লেটে যাওয়ার পথে অন্দরমহলের ফাঁকফোকর দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় একটা পুরুষ অবয়বকে হাঁটতে দেখলো। শাহানা ভয় পেয়ে যায়। পুরুষ অবয়বটি শাহানাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। শাহানার দিকে এগিয়ে আসে। শাহানা ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করলো,'তুমি কেলা?'
মৃদুলের মুখটা ভেসে উঠে। সে হেসে বললো,'আপা,আমি।'

মৃদুলকে দেখেই শাহানার মেজাজ তুঙ্গে উঠে। সে চোখ রাঙিয়ে বললো,' কুত্তার বাচ্চা,তুই আমার সামনে আইবি না। লুলা(পঙ্গু) বানায়া দিছস আমারে!'
মৃদুল কাতর স্বরে বললো,'ছুডু ভাইয়ের লগে এমন করবা? আমি তো তোমারে দেখি নাই। ইচ্ছা কইরা মারি নাই।'
'এই তুই যা। সামনে থাইকা সর।'
শাহানা গজ গজ করতে করতে টয়লেটের দিকে চলে যায়। মৃদুল ঠোঁট উল্টে শাহানার যাওয়া দেখে। তারপর সিঁড়ির দিকে তাকালো। তার ঘুম আসছে না একটুও। পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো সারাগায়ে মেখে অনেকক্ষণ গল্প করতে। কোনো এক অদৃশ্য যন্ত্রনা বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় পূর্ণাকে একটু বেশিই যেন মনে পড়ছে। বুকটা ফাঁকা,ফাঁকা লাগছে। অস্থিরতায় রুহ ছটফট করছে। মৃদুল তিনবার বিসমিল্লাহ বলে,তিনবার বুকে ফুঁ দিল। তারপর আর কিছু না ভেবে তৃতীয় তলায় উঠে আসে। শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতর কেউ বুঝি ঢোল পিটাচ্ছে! সে শুনতে পাচ্ছে। মিনিটের পর মিনিট সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কবুতরের মতো ডাকলো! মৃদুল যে কবুতরের মতো ডাকতে পারে, পূর্ণা আর মৃদুলের পরিবার ছাড়া কেউ জানে না। পূর্ণা যদি জেগে থাকে তাহলে মৃদুলের নকল ডাক সে চিনতে পারবে। তারপর নিশ্চয় সাড়া দিবে! মৃদুল পূর্ণার জন্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। পূর্ণার দেখা নেই। মৃদুল ভাবলো,পূর্ণা ঘুমে বোধহয়। তাই সে আর অপেক্ষা করার কথা ভাবলো না। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। তখন দরজা খোলার শব্দ কানে আসে। মৃদুল পিছনে তাকাতে গিয়েও তাকালো না। যদি পদ্মজা হয়! মৃদুল দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হয়। তখন পূর্ণা ডাকলো,'দাঁড়ান।'
মৃদুল ঘুরে দাঁড়ালো। সাদা রঙের উপর নীল সুতোর কাজের নকশিকাঁথা
গায়ে জড়িয়ে পূর্ণা হেঁটে আসছে। মৃদুল পূর্ণার সাক্ষাৎ -এর আশায় ছিল।।যখন পূর্ণার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল,বুঝতে পারলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। অস্বস্তি হচ্ছে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হচ্ছে! তবে সেই যন্ত্রণা প্রাপ্তির! পূর্ণা সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো,'ছাদে চলুন। তারপর কথা বলবো।'

দুজন একসাথে ছাদে উঠে আসে। ছাদে উঠতেই রাতের পৃথিবীর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যময় সমারোহ চোখে পড়ে। আকাশে ইয়া বড় চাঁদ। দুজন মুগ্ধ নয়নে চাঁদের দিকে তাকালো। সৌন্দর্যের মাদকতা ছড়িয়ে পড়ে দুজন প্রেমীর মনে। মৃদুল পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণাও তাকালো। চোখাচোখি হতেই দুজন হেসে ফেললো। মৃদুল প্রশ্ন করলো,'ঘুমাও নাই?'
'না। ঘুম আসছিল না।'
'একটু ভালা লাগতাছে?'
'হুম।'
'ভাবি ঘুমে?'
'হুম।'
'ভাবি কিছু কইছে?'
পূর্ণা মুখ ভার করে বললো,'না। অনেকবার প্রশ্ন করেছি,ভাইয়ার সাথে কী হয়েছে? মুখে,গলায় কীসের দাগ? আপা উত্তর দেয়নি। আপার মুখের উপর কথা বলার সাহসও হয়নি।'
মৃদুল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,'কিছু একটা তো হইছেই।'
আচমকা মনে পড়েছে এমনভাবে পূর্ণা বললো,'তবে আমি ঘুমের ভান ধরে ছিলাম। তখন টের পেয়েছি আপা নীরবে কাঁদছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপার জন্য। আপার কীসের কষ্ট না জানা অবধি আমি শান্তি পাবো না।'

Kobitor.com

'আমির ভাইয়ের সাথে কিছু হইছে।'
'ভাইয়ার দেখা পেলেই হতো।' বললো পূর্ণা। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। তারপর আবার বললো,'কাল লিখন ভাইয়ের খবর এনে দিতে পারবেন?'
'পারব। চিন্তা কইরো না। লিখন ভাইয়া ঠিক হইয়া যাইব।'
পূর্ণা আর কিছু বললো না। সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলো। মৃদুল বললো,'রাতের আকাশ তোমার কেমন লাগে?'
পূর্ণা খোশ মেজাজে জবাব দিল,'অনেক ভালো লাগে! আমার আম্মা,আপা,প্রেমা সবাই জ্যোৎস্না রাত পছন্দ করে। আমাদের অনেক মুহূর্ত আছে জ্যোৎস্না রাত নিয়ে। আপনার কেমন লাগে?'
মৃদুল হাসলো। তারপর বললো,' রাতের আকাশ কুনোদিন(কোনদিন) আমার দেখার ইচ্ছা হয় নাই। এমনি রাইতে বার হইলে বার হইতাম। আকাশ দেখার লাইগগা বার হইতাম না। প্রথম তোমার সাথে দেখতে আইলাম।'
পূর্ণা মৃদুলের দিকে তাকালো। তারপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললো,'এত্ত সুন্দর মানুষের পাশে আমার মতো কালো মানুষকে দেখে চাঁদ কী লজ্জা পাচ্ছে না?'
মৃদুল বললো,'চান্দের কীসের এত্ত দেমাগ যে,পূর্ণার গায়ের রঙ নিয়া লজ্জা পাইবো?'
পূর্ণা ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকালো। জ্যোৎস্নার রূপ-মাধুরী নিজ চোখে অবলোকন করার সৌভাগ্য পূর্ণার বহুবার হয়েছে। কিন্তু আজকের সময়টা অন্যরকম লাগছে। মায়াবী এক অনুভূতি সর্বাঙ্গে শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। মৃদুল বললো,'বইসা কথা বলি।'
'কোথায় বসবো? ছাদ তো কুয়াশায় ভেজা।'
মৃদুল চট করে তার লুঙ্গি খুললো। পূর্ণা শুরুতে চমকে যায়। পরে দেখলো,মৃদুলের পরনে প্যান্ট আছে! মৃদুল তার লুঙ্গি ছাদের মেঝেতে বিছিয়ে বললো,'বইসা পড়ো।'
পূর্ণা মনে মনে,আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বলে লুঙ্গির উপর বসলো। কিছুটা দূরত্ব রেখে মৃদুল বসলো। বললো,'প্যান্টের উপর লুঙ্গি পরার সুবিধা হইলো এইডা। যেকোনো দরকারে কামে লাগে। একবার টুপি ছাড়া রাইতে মাছ ধরতে গেছিলাম। ঠান্ডা বাতাসে মাথা সেকি বেদনা! এরপর করলাম কী...."
পূর্ণা বাঁধা দিয়ে বললো,'লুঙ্গি দিয়ে টুপি বানিয়েছেন তাই তো?'
মৃদুল গর্বের সাথে বললো,'হ। উপস্থিতি বুদ্ধি এইডা।'
পূর্ণা হাসলো। মৃদুল অনেক রাগী,অহংকারী। তবুও সে মুগ্ধ করার মতো একটা মানুষ। সবসময় ঠোঁটে হাসি থাকে। এই মুহূর্তে রেগে, ওই মুহূর্তে সব ভুলে যায়। পূর্ণা ছাদের মেঝেতে তাকালো। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় ছাদের মেঝেতে থাকা শিশির চকচক করছে। স্বচ্ছ রূপালি ঝরনার মতো চাঁদের আলো যেন চারপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে বারংবার। দুজনের মাঝে পিনপতন নিরবতা নেমে আসে । নিরবতা ভেঙে মৃদুল ডাকলো,'পূর্ণা?'
'হু।'
'আমার কাঁনতে ইচ্ছা হইতাছে।'
পূর্ণা হৃদয় কেঁপে উঠলো। সে মৃদুলের দিকে মুখ করে বসলো। বললো,'কেন?'
'জানি না। আমি যখন যেইডা চাইছি, পাইছি। এই প্রথম কিছু পাইতে গিয়া ভয় করতাছে।'
'কী সেটা?'
মৃদুল সরাসরি পূর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,'তোমারে! তোমারে পূর্ণা।'
নিস্তব্ধ প্রহরে, জ্যোৎস্নাময় রাতে একাকী দুজনের মাঝে প্রেমিক যখন বিভ্রম নিয়ে উচ্চারণ করে ভালোবাসার কথা প্রেমিকার হৃদয়ে কী হয়? জানে না পূর্ণা। তবে তার বেলা সে দমবন্ধকর এক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছে। সব পাখপাখালি তাদের নীড়ে ঘুমাচ্ছে শীতে। শুধু পেঁচারা জেগে

আছে। থেমে থেমে তারা ডাকছে। কনকনে শীতল হাওয়া বইছে। পূর্ণা মৃদুলের এক হাত ধরে বললো,'আপা সবসময় বলে, ভাগ্যে যা আছে তাই হয়। আল্লাহ কপালে যা লিখে রাখেন তাই হয়। তাই চিন্তা করবেন না।'
'তুমি আপনি করে আর কথা কইবা না। তুমি কইবা।'
পূর্ণা চট করে অন্যদিকে ফিরলো। বললো,'পারব না।'
'যা কইছি হুনো। নইলে কিন্তু?'
'কী করবেন?'
'ছাদ থাইকা ঝাঁপ দিয়া মইরা যামু।'
পূর্ণা ভ্রু কুঁচকাল। বললো,'এসব কী কথা?'
'দেখাইতাম ঝাঁপ দিয়া?'
মৃদুল গুরুতর ভঙ্গিতে কথা বলছে। এই ছেলে দেখানোর জন্য ঝাঁপ দিয়ে দিতেও পারে! পূর্ণা বললো,'আচ্ছা থাক,লাগবে না। আমি তুমিই বলবো।'
মৃদুল হেসে বললো,'তাইলে কও।'
'কী বলব?'
'তুমি।'
'তুমি।'
মৃদুল হাসলো। হাসলো পূর্ণাও। আকাশের বিশাল উজ্জ্বল চাঁদটি আর তার সাথি তারাদের নিয়ে পূর্ণা,মৃদুলের প্রেমকথন চলে সারারাত। দুজন মুঠো,মুঠো চাঁদের আলোকে স্বাক্ষী রেখে কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত। দিনে একটা অঘটন ঘটে যাওয়ার পরও প্রকৃতি তাদের মনেপ্রাণে প্রেম নিয়ে আসে গোপনে। এ যেন কোনোকিছুর ইঙ্গিত! নয়তো অসময়ে কেন এমন সু-সময় দেখা দিল?

_____
কাকডাকা ভোরে আমির হাওলাদার বাড়িতে পা রাখলো। সে সবেমাত্রই ফিরেছে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে নতুন বোঝা। যে বোঝা তাকে নুইয়ে রেখেছে। যখনি সে গোপন যুদ্ধে জয়ী হলো, দেখতে পেলো আলোর রেখা,তখনই সামনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকারের দেয়াল। সুখ নামক বস্তুটি নিমিষে আড়াল হয়ে গেল। এই পৃথিবী যেন তার বিরুদ্ধে চলছে। সে অনুভব করছে,এই পৃথিবী আর তার নয়। বিষের বাতাস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। পায়ের নিচের জমিন আর তাকে চায় না। শত,শত অভিশাপের বুলি কানে বাজে। অভিশাপগুলোকে তো সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাহলে তারা জীবনে ফিরে এলো কী করে? আমির জানে না। লতিফা অন্দরমহলের দরজা খুলে,আমিরকে দেখতে পেল। আমির লতিফাকে দেখে মাথা উঁচু করে। ঢোক গিলে বললো,'ভাত আছে? ঠান্ডা হলেও চলবে।'
লতিফার শরীর কেঁপে উঠে। আমিরের এরকমভাবে ভাত খোঁজাতে সে কেন যেন চমকে যায়! আমিরকে সে যমের মতো ভয় পায়। তাই কোনো প্রশ্ন করলো না। লতিফা অস্থির হয়ে পড়ল। বললো,'আনতাছি আমি। আনতাছি।'

সৌভাগ্যক্রমে আমিরের ভাগ্যে গরম ভাতই জুটে। ফজরের আযানের সাথে সাথে লতিফা রান্না বসিয়েছিল। ভাতের পাতিল নামিয়েই আমিরকে ভাত দিয়েছে। আমির প্রথম লোকমা মুখে দেয়ার পূর্বে লতিফাকে প্রশ্ন করলো,'পদ্মজা ভালো আছে?'
লতিফা গতকালের ঘটনা বলতে গিয়েও বললো না। বললো,'হ,ভালা আছে।'

আমির গাপুসগুপুস করে ভাত খেলো। সারা রাত্রি সে শীতবস্ত্র ছাড়া ছিল। ফলে শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই সদ্য রান্না হওয়া গরম ভাত খুব উপভোগ করে খেয়েছে। খাওয়া শেষে ২য় তলায় উঠলো। পদ্মজা কোরঅান শরীফ পড়ছে। তার মধুর সুর মনপ্রাণ জুড়িয়ে দেয়ার মতো। আমির ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ঘরে ঢুকে পদ্মজার দিকে তাকালো না। আলমারি খুলে জ্যাকেট,মোজা,টুপি বের করলো। পদ্মজা আড়চোখে আমিরকে দেখে,পড়ায় মনোযোগ দিল। আমির তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে এসে আবারও থম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি রয়ে যায় পদ্মজার ঘরের সামনে।
পাতালঘরের এওয়ানে রিদওয়ান শুয়ে ছিল। তার সাথে একজন সুন্দরী নারী। দুজনের অপ্রীতিকর অবস্থা। হঠাৎ আমিরের আগমনে রিদওয়ান চমকে যায়। তারপর হেসে আমিরকে বললো,' সব ঠিক আছে?'
আমির এক হাতে কপাল চেপে ধরলো। তারপর সেই নারীর উদ্দেশ্যে বললো,'এই শালী,শরীর ঢাক।'
আমিরের কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা। অশুভ সুন্দরী নারীটি দ্রুত চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। রিদওয়ান বললো,'ওরে বকতাছস কেন?'
আমির একটা খাম রিদওয়ানের মুখের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর এটুতে চলে গেল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮০
_____
পদ্মজা রান্নাঘরে জুলেখা বানুকে দেখে অবাক হলো। অচেনা হলেও সালাম দিল,' আসসালামু আলাইকুম।'
জুলেখা তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকালেন। অবহেলার স্বরে বললেন,'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'
রিনু ছিল রান্নাঘরে। পদ্মজা রিনুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় প্রশ্ন করলো, অচেনা মহিলাটি কে? রিনু হেসে বললো,'মৃদুল ভাইজানের আম্মা।'
পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটলো। জুলেখার দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললো,' দুঃখিত! চিনতে পারিনি। আপনি প্লেট ধুচ্ছেন কেন? রাখুন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'
জুলেখা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি চুপচাপ প্লেট ধুয়ে, চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। মুখের প্রতিক্রিয়াতে পদ্মজার প্রতি ছিল অবজ্ঞা,ঘৃণা। পদ্মজা মনে মনে আহত হয়। জুলেখার দৃষ্টি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়ার মতো ছিল। পদ্মজা জুলেখার যাওয়ার পানে চেয়ে রইলো। রিনু পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বললো,'আমার মনডা কয়,এই বেডির উপর জিনের আছড় আছে!'
পদ্মজা রিনুর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালো। বললো,'উনি আমাদের বাড়ির মেহমান! মুখে লাগাম দাও রিনু। পূর্ণার জন্য খাবার নিতে পারবো?'
লতিফা শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরে ঢুকলো। পদ্মজার প্রশ্নের জবাবে বললো,'হ পদ্ম, নিতে পারবা। খাড়াও আমি দিতাছি। তুমি খাইবা কখন?'

'পূর্ণা আর আমার খাবার একসাথেই দিয়ে দাও বুবু।'
'দিতাছি। রিনু জলদি ওই বাডিডা(বাটি) দে।'

রিনুর বদলে পদ্মজা এগিয়ে দিলো। খাবার নিয়ে উপরে যাওয়ার সময় পদ্মজাকে দেখে জুলেখা হাতের গ্লাস শব্দ করে টেবিলে রাখলেন। পদ্মজা বুঝতে পারে,জুলেখার ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ! বোধহয় গতকালের অপবাদ তিনি শুনেছেন। পদ্মজার ভয় হয়। পূর্ণার বিয়েটা হবে তো? জুলেখাকে দেখে মনে হচ্ছে,বিয়ের কথা বলার অবস্থাতেও তিনি নেই। জুলেখার কপাল আর ভ্রুযুগলে পদ্মজার চোখ আটকে যায়। যেন হেমলতার কপাল আর ভ্রু দেখছে সে। হুবহু একরকম! পদ্মজার বুকটা হুহু করে উঠে। সে দুই চোখ মেলে জুলেখার কপালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ। পদ্মজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলেখা উঠে চলে যান। পদ্মজার সম্বিৎ ফিরলো। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় চলে আসে। পূর্ণা দুই হাতে একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে পরম আবেশে ঘুমাচ্ছে। জুলেখার কপাল,ভ্রু দেখে জেগে উঠা ব্যথা পূর্ণাকে দেখে আরো বেড়ে যায়। হেমলতার যৌবনকাল পূর্ণার বর্তমান রূপের প্রতিচ্ছবি। সেই মুখ,সেই ঠোঁট,সেই গাল। নাকের পাটা মসৃণ। এতো মিল দুজনের! পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত রেখে হেমলতার কথা ভাবে।পুরনো স্মৃতিগুলো চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। পদ্মজা পূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো,'আম্মা।'
তার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। পূর্ণা কী কখনো জানবে? পদ্মজা পূর্ণার ঘুমন্ত মুখ দেখে বহুবার আম্মা বলে কেঁদেছে! সে মনকে বুঝিয়েছে, এইতো আম্মা আছে! আমার সামনেই আছে! আমি এতিম নই!

পদ্মজা হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছলো। পূর্ণা এতো আরাম করে ঘুমাচ্ছে যে পদ্মজার ঘুম ভাঙাতে মায়া হচ্ছে। কিন্তু বেলা করে খাওয়া তার একদম পছন্দ না। খেয়ে না হয় আরো ঘুমানো যাবে। পদ্মজা পূর্ণার চোখেমুখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে ডাকলো,'পূর্ণা? পূর্ণা? এই পূর্ণা?'
পূর্ণা ধীরে,ধীরে চোখ খুললো। পদ্মজা বললো,'সূর্য কখন উঠেছে খবর আছে? নামাযের তো নামগন্ধও নেই। যা দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। সে ঘুমে বিভোর। পদ্মজা আবার ডাকলো। জোর করে তুলে কলপাড়ে পাঠালো। পূর্ণা ঘুমিয়ে,ঘুমিয়ে কলপাড়ে গেল। ফিরে এলো সতেজ হয়ে। ঘরে প্রবেশ করেই সোজা লেপের ভেতর ঢুকে পড়লো। পদ্মজাকে আহ্লাদী স্বরে বললো,'খাইয়ে দাও আপা।'
পদ্মজা বিনাবাক্যে খাইয়ে দিল। পূর্ণা না বললেও খাইয়ে দিত। খাওয়ার মাঝে পূর্ণা কথা বলতে চেয়েছিল। পদ্মজা নিষেধ করে। খাওয়ার মাঝে কথা বলা ভালো না বলে চুপ করিয়ে দেয়। খাওয়া শেষে পদ্মজা বললো,' শেষরাতে কোথা থেকে ফিরছিলি?'
পূর্ণা চোখ বড়বড় করে তাকায়। তার হেঁচকি উঠে যায়। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। তাকিয়ে রইলো সরু চোখে। পূর্ণা পানি পান করে মিনমিনিয়ে বললো,'আর যাব না।'
পদ্মজা গুরুজনদের মতো বললো,'বাড়তি কথা না বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া বাধ্যতা।'
পূর্ণা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে নতজানু হয়ে বললো,'মৃদুল যে...উনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'
'সে ডেকেছিল?'
'হু।'
'আর তুইও চলে গেলি?'

পূর্ণার মনে হচ্ছে সে ফাঁসির দঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝুলে যাবে। পদ্মজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের দুই দিকে জানালা আছে। পূর্ব দিকের জানালা খোলা। উত্তর দিকেরটা বন্ধ। সে উত্তর দিকের জানালা খুলতে খুলতে বললো,' বিয়ের আগে মাঝরাতে দেখা করা কী ঠিক হলো? মৃদুল এখনো পর-পুরুষ। বিয়েও ঠিক হয়নি। যখন এসে শুয়েছিস তখন টের পেয়েছি। তার আগে টের পেলে কানে ধরে ঘরে নিয়ে আসতাম।'
পূর্ণা অপরাধী কণ্ঠে বললো,'আপা,আর যাব না। ক্ষমা করে দাও।'

পদ্মজা পূর্ণার পাশে এসে বসে। পূর্ণার হাতের উপর নিজের এক হাত রেখে বললো,'বিয়ের পর আমার বোনের জীবনে হাজার জ্যোৎস্না আসুক।'
পূর্ণা তার অন্য হাত পদ্মজার হাতের উপর রাখলো। তারপর পদ্মজার চোখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো,'আপা।'
'কী?'
'তোমাকে কে মেরেছে? কেন মেরেছে? তুমি রাতে কেন কেঁদেছো?'
পদ্মজা তার হাত সরিয়ে নেয়। চোখমুখে কাঠিন্য ভাব চলে আসে। কণ্ঠে গাম্ভীর্যতা রেখে পদ্মজা বললো,'প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলাম।'
পূর্ণা চোখ নামিয়ে বললো,'আপা,আমি জানতে চাই।'
পদ্মজা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো,'বাড়ি ফিরে যা। মৃদুলের আম্মা-আব্বা আসছে। যখন তোকে প্রয়োজন হবে ডেকে পাঠাব। তার আগে যেন এই বাড়ির আশেপাশেও না দেখি।'
পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। পূর্ণা তার পায়ের উপর থেকে দ্রুত লেপ সরাল। তারপর দৌড়ে পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়াল। অনুরোধ করে বললো,'আপা,আপা দোহাই লাগে বলো। আমি তোমার সব কথা শুনি। কিন্তু এইটা শোনা সম্ভব হচ্ছে না।'
'পূর্ণা!'
পূর্ণা আচমকা পদ্মজার দুই পা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,'আপা,পায়ে পড়ছি আমাকে সব বলো। তোমার গালের ক্ষত,গলার দাগ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি শান্তি পাচ্ছি না। কে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে? কে এতোবড় দুঃসাহস দেখিয়েছে? আমি তার কলিজা ছিঁড়বো।'
পূর্ণার চোখের জল পদ্মজার পায়ে পড়ে। পদ্মজা পূর্ণাকে টেনে তুললো। পূর্ণার কাজল নয়ন দুটি জলে টুইটুম্বুর। যেন স্বচ্ছ কালো জলের পুকুর।
পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বললো,'কাঁদুনি।'
পূর্ণা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজার শরীরে সে মা,মা গন্ধ খুঁজে পায়। সেই ছোটবেলা থেকেই পদ্মজা তার জীবন,তার আনন্দ। পদ্মজার গলার কালসিটে দাগটা যেন তারই বুকের আঘাত। রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। পদ্মজা পূর্ণাকে অপেক্ষা করতে বলে,নিজের ঘরে যায়। আলমগীরের দেয়া খাম নিয়ে ফিরে আসে। দরজা বন্ধ করে পূর্ণাকে নিয়ে বিছানার উপর বসলো। এরপর বললো,'আমি জানি,আমার বোন বড় হয়েছে। সেই সাথে ধৈর্য্য,জ্ঞানও বেড়েছে। আমি একটা কারণেই তোকে সব জানাব,যাতে সাবধান থাকতে পারিস। আমি চাই , সব জানার পর তুই নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিবি না। আমি যেভাবে বলবো,সেভাবে চলবি। রাজি?'
পূর্ণা বুঝতে পারছে সে ভয়াবহ কিছু জানতে চলেছে। উত্তেজনায় তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়েছে। পূর্ণা বললো,'রাজি।'
পদ্মজা হাতের খামটা পূর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো,'তিনটে চিঠি আছে। তিনটাই আলমগীর ভাইয়ার লেখা। আমি গতকাল পড়েছি। মন দিয়ে পড়বি। অনেক কিছু জানতে পারবি। আর যতটুকু বাকি আছে আমি বলব।'

পূর্ণা প্রবল আগ্রহ নিয়ে খাম খুলে তিনটে চিঠি বের করলো। পদ্মজার কথামতো প্রথম একটা চিঠির ভাঁজ খুললো।

বোন পদ্মজা,
সালাম নিও। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। সেদিনের রাতে তোমার আগমন আমার জীবনে নিয়ে এসেছে আনন্দ। পৌঁছে দিয়েছে আলোর জগতে। যে জগতে বাঁচার জন্য পিছনের প্রতিটি মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রণায় কাটিয়েছি। জানি না এতো পাপ করার পরও করুণাময় কেন আমার প্রতি এতো উদার হলেন! তিনি চেয়েছিলেন বলেই, তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হয়েছিলে। বাঁচিয়েছিলে আমাকে আর রুম্পাকে। যখন তুমি এই চিঠি পড়ছো,তখন তোমার অবস্থা কী আমি জানি না। হয়তো সব জেনে গিয়েছো নয়তো এখনো অন্ধকারে ডুবে আছো। যদি অন্ধকারে ডুবে থাকো তাহলে আমি তোমাকে আলোর সন্ধান দেব। সব জানার পর সিদ্ধান্ত তোমার। চিঠিটা বোধহয় বড় হয়ে যাবে। এক পৃষ্ঠাতে হবে না। ধৈর্য্য ধরে সবটুকু পড়ো। আমি তোমাকে একটা তিক্ত দীর্ঘ গল্প শোনাবো। গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু আমির হলেও জড়িয়ে আছি অনেকেই।
যখন আমিরের জন্ম হয় কাকি আম্মার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হই আমি। কাকি আম্মা বড় দুঃখী ছিলেন। কাকা মারধর করতেন খুব। নিজ চোখে কাকি আম্মাকে বিবস্ত্র করে মারতে দেখেছি। আমার ছোট মন লজ্জায় মিইয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু কাকা বা আব্বা কাউকে একটুও মায়া দেখাতে দেখিনি,লজ্জা পেতে দেখেনি। তাদের চোখেমুখে সর্বক্ষণ হিংস্রতা ছিল। আমি খুব ভয় পেতাম আব্বাকে। ভীতু ছিলাম। আমার কাছে আমার আব্বা,কাকাই ছিল ভূত,রাক্ষস। আমার আম্মা সবসময় পাথরের মতো নিশ্চুপ। তার অনুভূতি অসাড়। কাকি আম্মা ছিলেন আমার মা। তিনি বহুবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা ছেলের জন্য আক্ষেপ করেছেন। কাকি আম্মা বলতেন,সেই ছেলে এসে নাকি কাকি আম্মার সব দুঃখ ঘুচে দিবে। যখন সেই ছেলেটা এলো আমি অনেক খুশি হই। এবার বুঝি কাকি আম্মার কষ্ট কমবে। কাকি আম্মা বলেছিলেন, আমির হবে পুলিশ। সব অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবে আর আমি হবো শিক্ষক। শুধু কাকি আম্মার না আমারও ইচ্ছে ছিল আমি শিক্ষক হবো। ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াবো। সব বাচ্চাদের আদর্শ হবো। সবাই দেখে সালাম দিবে,সম্মান করবে। সারাক্ষণ হাতে একটা বই নিয়ে হাঁটবো। এই স্বপ্ন নিয়েই পড়তে থাকি স্কুলে। এর মাঝে আব্বা একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। বলে, সে নাকি আমাদের আরেক ভাই। তার নাম রাখে রিদওয়ান। আমরা চার ভাই হয়ে যাই। আমি,জাফর,রিদওয়ান,আমির একসাথে এক স্কুলে পড়েছি। রিদওয়ান,আমির এক শ্রেণির ছিল। ছোট থেকেই আমিরের শরীরে ছিল অবাক করার মতো শক্তি। ওর মেধা ছিল ধারালো। আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম,আমির পুলিশ হবে। অনেক বড় পুলিশ হবে। পুরো দেশ চিনবে। ঠিক তখনই আমাকে আর জাফরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় অভিশপ্ত এক কালো জীবনের সামনে। যে জীবনে টাকা, নারী আর রক্তের খেলা চলে। আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়,নারী হচ্ছে ভোগের বস্তু। পাতালঘরে বনেদি ঘরের দুই-তিনজন পুরুষের দেখাও মিলে। তারা দুজন নারীকে আমাদের সামনে কুৎসিত ভাবে আঘাত করে। আব্বা,কাকা উপভোগ করে সেই দৃশ্য। সেই অসহায় দুই নারীর চিৎকারে কলিজা ছিঁড়ে যায় আমার। আব্বা আর কাকার পায়ে পড়েছি যাতে তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু ছাড়েনি। রক্ত দেখে জাফর জ্ঞান হারায়। ও রক্ত সহ্য করতে পারতো না। রক্তে খুব ভয় ছিল জাফরের। একটা তেরো বছরের মেয়েকে বাঁধা অবস্থায় আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। আব্বা আমাকে বুঝায়,মেয়েটার সাথে কী করতে হবে! জানতে পারি, বাড়ির পিছনে জঙ্গলে অবস্থিত এই

পাতালঘর অনেক বছরের পুরনো। আমাদের বংশের প্রতিটি পুরুষের একমাত্র পেশা পতিতাবৃত্তি ও নারী ধর্ষণ। আমাদের অঢেল সম্পদ পতিতাবৃত্তির টাকায় করা। নারী বিক্রির টাকায় করা! একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে অভ্যস্ত করে দেওয়া হয় এই পথে। ঘৃণায় বমি করেছি অনেকবার। ধর্ষণের পর কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হতো মেয়েগুলোকে। আমার জীবন হয়ে উঠে দূর্বিষহ।

তবে ঘরে ফিরে শান্তি লাগতো। আমির ছিল সেখানে। আমিরের দুষ্টুমি আমাকে খুব হাসাতো। আমিরের একটা দোষ ছিল,ও রিদওয়ানকে খুব অত্যাচার করতো। দুজনের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। সে যাই হোক, আমিরের সঙ্গ ছিল শান্তির! ওর চঞ্চলতা,সাহসিকতা ছিল মুগ্ধ করার মতো। আমার সেই শান্তিও একদিন নষ্ট হয়ে যায়। যেদিন নানাবাড়ি থেকে ফিরে পাতালঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান আর আমিরের উপস্থিতি দেখি! আমির তখন পুরোদমে পনেরো বছরের একটা মেয়েকে পেটাচ্ছিল! আমিরের চোখেমুখের হিংস্রতা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না,আমার প্রিয় ভাইয়ের এই রূপ! এই জীবন!
এর পরের কথাগুলো তোমার জন্য খুব কষ্টের হবে পদ্মজা। দয়া করে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পড়া শুরু করো।

পূর্ণা থামে। তার শরীর কাঁপছে। অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। তার চোখে খুব ভয়,ঘৃণা। সে স্পষ্ট স্বরে উন্মাদের মতো ডাকলো,'আপা...এই আপা।'
পদ্মজা পূর্ণার এক হাত শক্ত করে ধরলো। বললো,'ভাইয়া আমাকে যা বলেছেন,তাই কর। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নে।'
পূর্ণার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার মাথা ভনভন করছে। শরীর যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। সে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে ধরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। বুকে অপ্রতিরোধ্য তুফান বয়ে যাচ্ছে! আমির তার কাছে আপন বড় ভাই। সম্মানীয় বড় ভাই! এই ব্যথা সহ্য করতে পারবে না সে। পুরো শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com